সাধুসন্তের
জীবনে
অলৌকিক
রহস্য
স্বামী দিব্যানন্দ

# সাধু সন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য

( তৃতীয় খণ্ড )

স্বামী দিব্যানন্দ

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৭০০০৭৩

## বিষয় সুচি

**স্বামী দিব্যানন্দের অন্যান্য গ্রন্থ**

পরলোক ও প্রেততত্ত্ব ১০'০০

তন্ত্ররহস্য

**পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়**

বাংলার তন্ত্র ১৬'০০

**ডক্টর সত্যপাল রুহিলা**

সাঁইবাবা : জীবন ও কথামৃত ১০'০০

# ইহুদী সন্ত শার্মাদ

সম্রাট শাজাহান তখন দিল্লীর তকতে। কোথেকে এক ইহুদী এসেছেন দিল্লীতে, বিদ্যাবুদ্ধি, আচরণ, ধর্মজ্ঞান সব দিক দিয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সম্রাটের। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো সম্রাটের বড় প্রিয়, দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও বটে। শার্মাদের গুণপণায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট তাঁকে দারার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। দিল্লীর সিংহাসনে বসা অবশ্য দারার ভাগ্যে আর ঘটে নি, শাজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙজেব দারা এবং অন্যান্য ভাইদের হত্যা করে পিতাকে বন্দী করে সিংহাসন অধিকার করে বসেছিলেন একথা সবারই জানা।

এর আগের কথা। শার্মাদ দারাকে শুধু লেখাপড়াই শেখান নি, ব্যবহারিক দিক ছাড়া শিখিয়ে ছিলেন তাঁকে সর্ব্বধর্মের মূল তত্ত্ব, বিশেষ করে হিন্দুদের গীতা আর উপনিষদের সারমর্ম, সুফীদের ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে যার বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তাঁর শিক্ষায় দারার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমেই উচ্চস্তরে উঠছে দেখে তিনি খুশী হয়ে বলেন, বাচ্চা, তোমার জন্যে বেহেস্তে সিংহাসন পাতা।

এই সময় দিল্লীর যে প্রধান কাজী ছিলেন নাম তাঁর কবি। কাজী কবি শার্মাদকে মোটেই পছন্দ করতেন না, কারণ শার্মাদ দারাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার অনুরাগী ভক্ত শিষ্যদের কাছে যে ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন তা কোরান বিরুদ্ধ। শার্মাদকে সরিয়ে দেবার মতলবে কবি আওরঙজেবের কাছে গিয়ে লাগালেন,—এতো ভাল কথা নয়? শার্মাদ দারাকে কেবলই বলেন তোমার জন্যে ত সিংহাসন পাতাই রয়েছে। এতে আপনার সমূহ ক্ষতি। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন কেন আমি ঐ কথা বলছি।

শুনে মহা বিরক্ত হয়ে ডেকে পাঠালেন আওরঙজেব শার্মাদকে। এলে বললেন, আপনি একথা বলে বেড়াচ্ছেন কেন?

কি ?

বলে বেড়াচ্ছেন—দারার জন্যে সিংহাসন পাতা।

তার বুদ্ধিশুদ্ধি ধর্ম্মজ্ঞান দেখে বলি—তার জন্যে বেহেস্তে সিংহাসন পাতা।

ঐ একই কথা হ'ল।

শার্মাদ মৃদু হেসে আওরঙজেবকে বললেন, আপনি একটু চোখ বুজুন ত।

শার্ম্মাদের কথা শুনে আওরঙজেব একটু চোখ বুঝলেই তাঁর সামনে ভেসে উঠল এক অদ্ভুত দৃশ্য! বেহেস্তে এক অপূর্ব্ব সিংহাসন পাতা, তাতে বসে রয়েছেন দারা, আর আওরঙজেব নিজে ভিখারী হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইছেন।

কাজী যে উদ্দেশ্যে আওরঙজেবের কাছে শার্মাদের নামে লাগিয়ে-ছিলেন, সে উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হ'ল না, বরং ফল হ'ল উল্টো। আওরঙজেব এতে বেশ একটু ভাবনায় পড়ে গেলেন।

এরপর আওরঙজেব যখন দিল্লীর তকতে তখনকার কথা। কাজী কবির শার্মাদের উপর রাগ ত যায়ই নি বরং বেড়েই আছে তাঁকে জব্দ করতে পারেন নি বলে, সুযোগ খুঁজছেন কিসে ওকে জব্দ করা যায়, দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। সে সুযোগ তাঁর মিলেও গেল। আধ্যাত্মিক সাধনার জীবনে সুউচ্চ স্তরে উপনীত হলে সাধককে যে অবস্থায় দেখা যায়, শেষের দিকে শার্মাদের ঠিক তাই হ'ল। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, নাঙ্গাবাবা, ভাস্করানন্দ প্রভৃতির মত তিনি অধিকাংশ সময় সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে দিল্লীর যত্রতত্র ঘুরাফিরা করতেন। হিন্দু সাধু সন্তদের মাঝে যারা পরমহংস অবস্থায় উন্নীত তাঁদের অনেকেরই এই রীতি। মুসলীম শাস্ত্রে এটা নিষিদ্ধ। আক্রোশ ত পূর্ব থেকেই ছিল, কাজী কবি এবার সুযোগ পেয়ে আওরঙজেবের কাছে শার্মাদের নামে নালিশ করতে গিয়ে বললেন, ইহুদীটা বড় বাড়াবাড়ি সুরু করেছে।

কি ?

নাঙ্গা হয়ে সে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ অবস্থায় সে জামা মসজিদেব সিঁড়িতে গিয়ে বসে। মুসলিম শাস্ত্রমতে জবর

গুনাহ্ এ। জাহাঁপনা ওর গর্দান নেবার হুকুম দিন।

শুনে আওরঙজেব একটু ভাবলেন, ভেবে বললেন, না, এই সামান্য অপরাধে কারো প্রাণদণ্ডের হুকুম দেওয়া ঠিক হবে না।

কাজী তখন তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্য পথ ধরলেন। শার্মাদ প্রায়ই বিশেষ করে জুম্মাবারে জামা মসজিদের সুদীর্ঘ সিঁড়ির ধাপে বসে থাকেন, আর আওরঙজেব অন্যদিন না হলেও ঐদিন জামা মসজিদে নমাজ করতে আসেন, আসেন তাঁর গাড়ীতে বসে। কাজী বাদশার গাড়োয়ানকে বলে দিলেন, বাদশাকে যখন মসজিদে আনবি তখন তাঁর গাড়িটা ঐ ইহুদী সাধুটাকে যেখানে বসে থাকতে দেখবি তার সামনে থামাবি।

কাজীর কথায় এক শুক্রবার ঠিক তাই করলো গাড়োয়ান। সুতরাং গাড়ি থেকে নামতেই নাঙ্গা শার্ম্মাদ একেবারে বাদশার সামনেই পড়ে গেলেন। বাদশার কোরান পড়া চোখে বড় বিসদৃশই লাগল এ মূর্তি। সিঁড়িতে শার্মাদের পায়ের কাছেই একটা কম্বল পড়ে ছিল। বিরক্ত বাদশা ভ্রূকুটি করে শার্মাদকে বললেন, ঐ ত পাশেই আপনার একটা কম্বল গড়াচ্ছে, ওটা দিয়ে গা-টা ঢেকে রাখলে ইত হয়।

কোন প্রয়োজন বোধ করছি না আমি, ঢাকা প্রয়োজন বোধ করেন ত ওটা তুলে আপনিই আমাকে ঢেকে দিতে পারেন।

শার্মাদের কথায় বাদশা নিজেই হাত দিয়ে তুললেন কম্বলটা। কিন্তু একি! কম্বল তুললেই যে তাঁর চোখে পড়ল দারা আর অন্যান্য সব ভাইদের হত্যা করে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন তাদের ছিন্ন-মুণ্ড, রক্তে সিঁড়ি এবং কম্বলের কিছুটা অংশ তখনও ভিজে। দেখে শিউরে উঠলেন আওরঙজেব। শার্মাদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ঐ কম্বল দিয়ে পারেন ত আপনার নিজের লজ্জা ঢাকুন।

শার্মাদের এ উক্তি কি চাবুকের মত ঘা দিয়েছিল বাদশার মনে? কে জানে—ঈশ্বরই—জানেন।

কাজী যে কৌশলে শার্মাদকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তাতে কোন ফল হ'ল না, বরং বলা যায় উল্টো ফল হ'ল: বাদশার আঁতে ঘা লাগল। এরপর কাজীর প্ররোচনায় শার্মাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ

আর দিতে পারলেন না বাদশা।

কিন্তু শার্মাদের দুশমন কবি মুসলিম ধর্ম মতে এতে এর চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক অপরাধ খুঁজে পেলেন। শার্মাদ তাঁর ভক্ত শিষ্যদের কাছে হামেশাই বলেন, এনাউল হক—অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর। এ মতটা অবশ্য ভারতের বেদান্তের মত : সোঽহং। কাজী কি এমন সুযোগ ছাড়তে পারেন! তিনি অমনি গিয়ে সম্রাট আওরঙজেবকে ধরে বসলেন, আপনিও বারবারই– ইহুদীটাকে রেহাই দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ও ওর চেলাদের কাছে, লোকের কাছে কি বলে বেড়াচ্ছে জানেন?

কি?

ও সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছে এনাউল হক—আমিই ঈশ্বর।

ইসলাম বিরোধী এ উক্তি ত বরদাস্ত করা যায় না—ভাবলেন আওরঙজেব। কাজী তাঁর ভাব বুঝে বলে উঠলেন। এর একমাত্র শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড। এ দণ্ড ওকে না দিলে ইসলাম মতে আপনারই গুনাহ্ হবে। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় আপনি আপনার আমীর ওমরাহদের ডাকুন, ডাকুন যত কাজী আছেন, আছেন যত মসজিদের ইমাম। তাঁদের সবাইকে নিয়ে সভা করে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করুন—কি শাস্তি ওর প্রাপ্য ইসলাম ধর্ম মতে।

কবির কথায় তাই করলেন আওরঙজেব। দিল্লীর লাল কেল্লায় শার্মাদের বিচারের জন্য—এক সভা বসল। সে সভায় রাজধানীর মান্যগন্য;—মুসলমান সবাই উপস্থিত, উপস্থিত সন্ত শার্মাদের অনুরাগী হিন্দু-মুসলমান চেলাসমেত বহু বহু লোক। শার্মাদকেও হাজির করা হ'ল সেখানে।

সর্বজন সমক্ষে আওরঙজেব শার্মাদকে বললেন, আপনি—এ বলে বেড়াচ্ছেন কেন?

কি?

বাদশা দুই কানে আঙুল দিয়ে বললেন, আপনি লোকের কাছে বলে বেড়ান এনাউল হক।

শার্মাদ স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, সত্যিই ত : তাই এনাউল হক।

কাজী কবি অমনি বলে উঠলেন, শুনলেন ত জাহাঁপনা এবার নিজের কানে? শুনলেন ত আপনারা সবাই? ইসলাম ধর্ম মতে এর গর্দান নেওা ছাড়া আর কোন বিধান নেই।

অন্যান্য কাজী এবং ইমামদেরও হল এই মত। বাধ্য হয়ে বাদশাকে শামাদের গর্দান নেবার হুকুম দিতে হল।

কাজী ধরে বসলেন, এ ব্যাপারে আপনার দেরী করা চলবে না। দিল্লী এবং দিল্লীর আশেপাশে ওর অনেক চেলা, অনেক ভক্ত অনুরাগী সমর্থক। দেরী করলে তারা জোটবদ্ধ হয়ে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

কাজীর কথায় পরের দিনই শার্মাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে সাব্যস্ত করলেন বাদশা। বিদ্রোহের আশঙ্কা করে দিল্লীর পথে ঘাটে—সর্বত্র সৈন্য মোতায়েন করা হল।

পরের দিন জামা মসজিদের সামনে অসংখ্য লোকের ভিড়। শার্মাদের কোরান বিরোধী উক্তির দণ্ড দেওয়া হবে এইখানে।

যথা সময়ে অগণিত লোকের সামনে বাদশার হুকুমে জল্লাদ তলোয়ার হাতে এগিয়ে এল শার্মাদের সামনে।

শার্মাদের চোখেমুখে ভয় উদ্বেগ দুঃখের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, ফুটে উঠেছে সেখানে স্নিগ্ধমধুর হাসি, যেন কোন অন্তরঙ্গ অভিন্নহৃদয় বন্ধুকে দেখে তাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছেন তিনি।

ঘাতকের তলোয়ারের ঘায়ে শার্মাদের ছিন্নমুণ্ড যখন মাটিতে গড়িয়ে পড়ল তখন তাঁর প্রতি রক্তকণা থেকে ধ্বনিত হতে লাগল—এনাউল হক।

তারপর যা বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল তা কেউ কোনদিন দেখে নি, এমন কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না। শার্মাদের মুণ্ডচ্যুত দেহটা উঠে দাঁড়িয়ে মুখটা মাটি থেকে হাতে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চলতে সুরু করলো যমুনার দিকে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—তখনও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে—এনাউল হক, এনাউল হক।

এই সময় তাঁর সামনে আবির্ভূত হ'লেন তাঁর স্বর্গত গুরু—ভিখ সূক্ষ্মদেহে। তিনি এসে স্নিগ্ধ প্রশান্ত কণ্ঠে শার্মাদকে বললেন বৎস,

তুমি তোমার শিষ্যদের যে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছ, তাতে আমি প্রীত, প্রসন্ন। কিন্তু আর কেন, এবার বিশ্বপ্রকৃতিকে তার নিজের কাজ করতে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে শার্মাদের ছিন্ন-মুণ্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দিল্লী জামা মসজিদের সামনে ভারতের বেদান্তমতের সাধক এই ইহুদী সন্তের সমাধি এখনও বিদ্যমান।

———

# একটি অদ্ভুত বালকের কাহিনী

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শুধু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়েই অসাধারণ ছিলেন না, আধ্যাত্মিক সাধনার দিক দিয়েও তিনি অতি উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছিলেন। সুদীর্ঘকাল বারাণসীতে অবস্থানকালে অনেক উচ্চকোটির সাধু-সন্তের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে তিনি কিছু কিছু বইও লিখে গিয়েছেন। তাঁর রচিত 'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে পূর্ব্বজন্মে সিদ্ধ যে একটি অদ্ভুত বালকের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা যেমনি বিস্ময়কর তেমনি অলৌকিক। সাধু সঙ্গের জীবনে অলৌকিক রহস্যের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বালকটির অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। বিবরণটি আমি অবশ্য অতি সংক্ষেপে নিজের ভাষায়ই দেব।

১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাস। কবিরাজজীর এক পুরানো বন্ধু এসে একদিন তাঁকে বললেন, কাশীতে একটা অদ্ভুত ছেলের কথা সবাই বলাবলি করছে—শুনেছ? কোন কোন কাগজেও তার কথা ছাপা হচ্ছে। ছেলেটি নাকি তার স্থূল দেহ ছেড়ে সূক্ষ্মদেহে লোক লোকান্তরে বিচরণ করে এবং ফিরে এসে সে যা যা সব দেখে এল তা

বর্ণনা করে, ব্যাখ্যাও করে। কি ব্যাপার, ভাই কিছু বুঝছি না ত!

বন্ধুর মুখে এই কথা শুনে কবিরাজজীর মনে বিশেষ আগ্রহ জন্মালো ঐ ছেলেটিকে দেখবার। অপরের মুখে শোনার চেয়ে নিজে একবার দেখে তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে এলেই ব্যাপারটা সত্যিই কি তা ভাল বোঝা যাবে—ভাবলেন তিনি।

ঐ সালের ১০ই অক্টোবর কবিরাজজী সতীশচন্দ্র নামে তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে ছেলেটিকে দেখবার জন্য বাড়ি থেকে রওনা হ'লেন। সতীশচন্দ্রের পিতা এক সময় কবিরাজের দেওয়ান ছিলেন। দুই বন্ধুকে যিনি বালকটির কাছে নিয়ে গেলেন—নাম তাঁর শ্রীনাথ চক্রবর্তী। ইনি বয়সে বৃদ্ধ, বালকটির গৃহ শিক্ষক, তাই তার সম্বন্ধে সব কিছুই জানতেন। বালকটি বাঙ্গালীটোলার হাইস্কুলে পড়ত, বয়স তখন তার ষোল, নাম কেদারনাথ, জাতিতে মালাকর।

ছেলেটির বাবা কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন, বাড়িতে আছেন তার মা আর দিদি, তারাই তার অভিভাবক।

এরা তিনজন ছেলেটির বাড়ীতে গেলে ছেলেটির মা ও দিদি তাকে নিয়ে এঁদের কাছে এসে বিশেষ অভ্যর্থনা করে বসিয়ে ছেলেটির অবস্থার যে বিবরণ দিলেন তাতে বুঝা গেল, কেদারের সত্যি যে কি হয়েছে তা তাঁরা ঠিক বুঝে উঠছেন না। তাকে দেখে তার কথা শুনে নানা লোক নানা কথা বললে: কেউ বলছে ভৌতিক আবেশ, কেউ বলছে তীব্র বায়ুর প্রকোষ্ট। তাই ওঝা ডেকে এবং তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারাও যেমন ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তেমনি হচ্ছে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথী, এলোপ্যাথী, বায়োকেমিক ইত্যাদি প্রণালী দ্বারাও হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

ছেলেটির সম্বন্ধে তার মা আর দিদির মুখে যা কিছু শোনা গেল তাতে কবিরাজজী বুঝলেন—ওদের সবারই ধারণা দৈহিক বা মানসিক বিকৃতির ফলেই বালক কেদারের এই অবস্থা হয়েছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? প্রকৃত তথ্য জানবার জন্যে কবিরাজজী এবার কেদারের মা ও দিদির সঙ্গে আর কিছু আলোচনা না করে কেদারের সঙ্গেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। কেদারকে জিজ্ঞাসা করা হ'লে সে সরল

ভাবেই তার এই অবস্থার ইতিহাস আনুপূর্বিক বর্ণনা করলে। সে বললে—

রোগ টোগ কিছু আমার হয়নি, কোন বিকারও না, কিন্তু মা তা বুঝতে পারছেন না। আমার চলাফেরা, আচরণ কথাবার্তা অন্য সবার মত নয় বলে আমাকে রোগী বলে ধরে নিচ্ছেন সবাই। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়।

আমি যখন আমার দেহ থেকে বেরিয়ে যাই তখন আমার বেশ জ্ঞান থাকে, বাইরে নানা জায়গায় গিয়ে নানা কিছু দেখে আবার যখন নিজের দেহে ফিরে আসি তখনও আমার জ্ঞান ত থাকেই, তা ছাড়া যা কিছু দেখে এলাম তা-ও মনে থাকে। সূক্ষ্ম জগতে ঘোরাফেরার সময় আমি একটা ক্রম ধরে চলি, আর এই ক্রম আলোচনা করলেই বুঝা যায় আমার একদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্যদিনের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং একে আপনারা আমার বিকৃতি বলবেন কি করে?

ছেলেটি এই কথা বলার পর কবিরাজজী তাকে পরপর যে সব প্রশ্ন করলেন তার সে যে সব উত্তর দিল তাতে তিনি বুঝলেন তার এ অবস্থাটি কোনমতেই কোন রোগ নয়, দেহ নির্মুক্ত আত্মার সূক্ষ্মজগতের অনুভূতি মাত্র।

কেদার তার এই অবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব ইতিহাস যা বললে তা এইরূপ—

প্রায় একমাস দেড়মাস আগে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন সকালে সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বাজার করতে যাচ্ছিল। বাজারে ঢুকবার আগে তার নজরে পড়ল কে একজন রক্তবর্ণ পুরুষ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে, কেদারের মনে হচ্ছিল ঐ পুরুষ যেন তাকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করছে। বাড়ি থেকে বাজারে আসবার সময় কেদার তার বন্ধুর সঙ্গে গলা ধরাধরি করে আসছিল,—এ সময় ঐ রক্তবর্ণ পুরুষ তাকে স্পর্শ করে নি, শুধু তার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু বাজারে ঢুকবার সময় কেদারের বন্ধু কেদারকে ছেড়ে যেতেই ঐ রক্তবর্ণ পুরুষটি কেদারকে একবার স্পর্শ করেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, কেদারও

তার কথা ভুলে যায় এবং বাজার করে যথা সময়ে বাড়ি ফিরে আসে।

সেইদিন রাত্রেই কেদার জ্বরে আক্রান্ত হয়, এই জ্বরে সে কয়েকদিন ভোগে। এই জ্বর অবস্থায় থাকবার সময়ই সে তার পরলোকগত পিতাকে দেখতে পায়, পিতার সঙ্গে পিতার পরলোকগত গুরু রসিকবাবুও ছিলেন। তাঁরা তাকে তার দেহে থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বলেন, কিন্তু তাতে প্রথমে রাজী হয় নি, কারণ কি করে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হয় তা তার যেমন জানা ছিল না—তেমনি নিষ্ক্রান্ত হবার ইচ্ছাও তার ছিল না। কিন্তু তাঁরা পর পর এসে তাকে অমন অনুরোধ করতে থাকায় একদিন সে নিজের অজ্ঞাতেই নিজের দেহ থেকে বের হয়ে পড়ে। কি করে যে বেরুল তা ঠিক সে বলতে পারে না। মনে ইচ্ছা হবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে সে তার দেহ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এরপর সে তার পরলোকগত গুরুজনদের অনুগমন করে সেদিন অনেক অপূর্ব স্থান দর্শন করে।

এই যে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া সুরু হ'ল এরপর তা আর তার একদিনও বাদ যায়নি। কোন কোন দিন সে তিনবারও তার দেহ ছেড়ে বেরিয়েছে।

কবিরাজজী এরপর প্রায় প্রতিদিনই কেদারের কাছে গিয়ে নূতন নূতন প্রশ্ন করেছেন এবং কেদার সে সব প্রশ্নের যা যা উত্তর দিয়েছে তা আলোচনা করে নিঃসংশয়ে বুঝেছেন কেদারের এ অবস্থা কোন দৈহিক পীড়াও নয় অথবা বায়ুর প্রকোপ বশতঃ কোন মানসিক বিকারও নয়, এর মূলে এমন কোন গভীর সত্য বিদ্যমান যার অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক এবং সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপনও।

কবিরাজজী তাঁর বন্ধুদের নিয়ে কেদারের বাড়িতে বারবার যাচ্ছেন এবং তার সঙ্গে নানা গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন দেখে কেদারের মা, দিদি এবং আত্মীয়স্বজন বুঝলেন কেদারের এ অবস্থা কোন দৈহিক বা মানসিক বিকৃতির ফলে হয়নি, এ কোন অলৌকিক শক্তির লীলা।

কেদার যখন প্রথম প্রথম তার দেহ ছেড়ে বাইরে যেত তখন তাকে নেবার জন্য দূত আসত, সে সেখানে নিয়ে যেত সেখানকার কাজ হ'লে

সেই দূতই আবার তাকে নিজের দেহের কাছে পৌঁছে দিত। তার দেহে সে নিজেই প্রবেশ করতে পারত। এই সব দূত, যমদূত, বিষ্ণুদূত প্রভৃতির ন্যায় অতিবাহিক দেবতা বিশেষ, অথবা কেদারের কল্যাণকামী কোন বিদেহী আত্মা। কেদারের কিছু অধিকমাত্রায় শক্তির বিকাশ হ'লে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে আর ঐ রকম কোন বিদেহীর সাহায্যের প্রয়োজন হ'ত না, সে নিজেই দেহ থেকে বেরিয়ে আবার তাতে প্রবেশ করতে পারত।

প্রথম অবস্থায় কেদার তার দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে কেউ না কেউ তার দেহ স্পর্শ করে থাকত, কারণ এ না করলে তার দেহে নানা রকম বিদেহী আত্মার প্রবেশের আশংকা থাকে। আমাদের এই বায়ুমণ্ডলে নিম্নস্তরের বহু আত্মা অহরহ বিচরণ করে, জীবিতের স্পর্শ দ্বারা দেহ রক্ষিত না হ'লে ঐ ধরণের আত্মার উপদ্রব অনিবার্য। কবিরাজ মশায় নিজেই একবার ঐ রকম ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন ঃ সেদিন কেদারের আসতে একটু দেরী হচ্ছিল, আর যে লোকটি তার দেহ স্পর্শ করেছিল, কোন বিশেষ কারণে অল্পক্ষণের জন্য সে স্থানান্তরে যায়, এই সময় এক দুষ্ট প্রকৃতির বিদেহী তার দেহে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়, ভাগ্যক্রমে কেদার তখনই তার দেহে ফিরে আসায় কোন অনর্থ আর ঘটে নি।

কেদার বিভিন্ন স্তরে যেত সেখানকার দিব্যশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে। যে স্তরে তার যে কাজ আছে অর্থাৎ যা শিক্ষনীয় আছে তার তা শেখা হয়ে গেলে সে স্তরে তাকে আর যেতে হত না, যেতে হত অন্য স্তরে—অন্য কিছু করবার জন্যে বা জানবার জন্যে। এমনি করে কয়েক বৎসরে বহু স্তর ভ্রমণ করেছে। কোন কোন স্তরে গিয়ে সে পরিচিত আত্মারও দেখা পেত, এই সব আত্মার মাঝে কেউ বা স্থূল দেহ ত্যাগ করে এখন পরলোকে আবার কেউ বা এখনও স্থূলদেহে বর্তমান। একটি উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয়, কাশীর প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ হরিহর বাবা তখনও জীবিত। স্থূল দৃষ্টিতে তিনি তখন কাশীর অসি ঘাটের কাছে গঙ্গায় এক নৌকার উপর অবস্থান করছেন, কিন্তু কেদার তাঁকে একদিন ধ্রুবলোকে দেখে এল। ফিরে এসে কেদার সেদিন বললে, হরিহর বাবা আর বেশীদিন জীবিত থাকবেন

না, তাঁর আত্মা ধ্রুবলোকের কাছে বেশি মাত্রায় স্থিতিলাভ করেছে। ওখানেই তাঁর দেহমুক্ত আত্মার আবাস। ইচ্ছামৃত্যু তাঁর, তাই তাঁর ঐ ঊর্ধ্বস্থিত আত্মার আকর্ষণে তাঁর দেহস্থিত আত্মা দেহ ত্যাগ করে ঐখানে চলে যাবে।

ইন্দ্রপুরীতে নারায়ণের অধিষ্ঠান। মাঝে মাঝে কেদার ইন্দ্রপুরীতে গিয়েছে, অধিষ্ঠাতার আহ্বানেই গিয়েছে। এই রকম সব আহ্বান সে স্পষ্ট শুনতে পায়। আহুত হয়ে গেলে আকর্ষণ শক্তির সাহায্য পাওয়া যায় বলে যেতে পথে কোন কষ্ট হয় না। একবার বিনা আহ্বানেই সে ইন্দ্রপুরীতে যাবার চেষ্টা করেছিল। দিনটা ১৯৩২ সালের ২৬শে নভেম্বর। ইন্দ্রপুরীতে সেদিন কি একটা বড় রকমের উৎসব ছিল। সমগ্র ধামটি আনন্দে ভরপুর। কেদার ইচ্ছা করা মাত্র দূত এসেছিল। পথেও আনন্দের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কেদার কিন্তু পুরীতে ঢুকতে পারে নি, দ্বার বন্ধ ছিল। কেদার দেখতে পায়নি কিছু দিব্যচক্ষু দিয়েও নয়। সে বলেছে,—তার ঊর্ধ্বনেত্র খোলা থাকলে সে দেখতে পেত। বলা বাহুল্য ঊর্ধ্বনেত্র তখনও তার খোলে নি। মাত্র তৃতীয় নেত্র খুলেছে।

ইন্দ্রপুরীতে একদিন নারায়ণের আরতি দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল কেদার। নারায়ণের আরতি অবশ্য নিত্যই হয়। এই সময় নারায়ণ আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় শূন্যে অবস্থান করেন, চোখ দুটি থাকে স্থির অর্ধোন্মীলিত। দেবদেবীরা সবাই একসঙ্গে মিলে আরতি করেন। একসঙ্গে তেল ঘি এবং আগুন ছাড়াই অনেক প্রদীপ জ্বলে ওঠে, হীরের প্রদীপ—অনেক, অসংখ্য। নারায়ণের সামনে প্রদীপ ধরে ঘুরাতেই ওগুলি আপনিই জ্বলে ওঠে। ধূপ ধুনোর গন্ধ ছড়ায় চারিদিকে, নানা রকম মধুর বাজনা বাজতে থাকে। কেদার যেদিন নারায়ণের আরতি দেখেছিল সেদিন তার মনে হয়েছিল—এ আরতিতে নারায়ণ যেন আনন্দে আত্মহারা। তার গা দিয়ে তখন পদ্মগন্ধ বেরুচ্ছিল, প্রতি অঙ্গ থেকে স্নিগ্ধ সূর্য্য রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

কেদার বলত—আরতির পর নারায়ণের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বিভিন্ন বস্তু নির্গত হয় এবং ভক্তদের সামর্থ্য ও অধিকার ভেদে ওগুলি তাদের

কারো হাতে, কারো বুকে—কারো বা ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে।

কয়েক বৎসর ধরেই কেদারের এই রকম অবস্থার চলছিল—শক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে এতে সে ক্রমেই উন্নতি লাভ করেছিল। শেষের দিকে তাকে আর দেহ ত্যাগ করতে হত না, দেহে অবস্থান করেই সে নিজের প্রয়োজন মত সব কিছু দেখতে পেত। দেশগত ব্যবধান তখনকার ঘুচে গিয়েছিল।

এই সময় একদিন সে আশাতিত-ভাবে এক মহাসিদ্ধ লোকোত্তর মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে। ঘটনাটা এই—

একদিন বিকেলে এক দিব্যপুরুষ কেদারের কাছে আবির্ভূত হয়ে উক্ত মহাপুরুষের কথা বলে পরদিন বিকেল চারটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। কেদারের বুঝতে বাকী রইল না যিনি সাংবাদটি দিতে এসেছিলেন মহাপুরুষের বার্তা বহন করে কেদারের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর কাজ ছিল। কেদার যখন জিজ্ঞেসা করলে কোন রাস্তা ধরে কোথায় গেলে আমি এঁর দেখা পাব তখন দিব্য পুরুষটি বললেন, প্রথমে তুমি চ'কের রাস্তা ধরে বিশ্বেশ্বর গঞ্জ অবধি যাবে, ওখানে গেলেই তুমি আপনা থেকেই পথের সন্ধান পেয়ে যাবে, কাউকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার দরকার হবে না।

পরের দিন বিকেল চা'রটের সময় কেদার একটা সাইকেল চড়ে বিশ্বেশ্বর গঞ্জের দিকে রওনা হ'ল, সঙ্গে আর কাউকে নিল না। বিশ্বেশ্বর গঞ্জে যাওয়ার পরিচিত রাস্তা ধরেই সে চললো, বিশ্বেশ্বর গঞ্জে পৌঁছানোর পর তার সামনে পড়ল এক বিরাট ময়দান। আগেও ত সে এখানে এসেছে, কিন্তু তখন ত এমন কোন ময়দান তার চোখে পড়ে নি! কেদার দেখলে—বিশ্বেশ্বর গঞ্জ থেকে একটা সোজা পথ মাঠের মাঝখানে গিয়েছে,—দুই ধারে তার চষা ক্ষেত আর নানা সুন্দর দৃশ্য। মাঠের মাঝখানে একটা মস্ত বড় পাথর, আর ঐ পাথরের উপর বসে রয়েছেন মহাপুরুষ। তাঁকে দেখেই কেদার বুঝলে ইনিই তাকে ডেকেছেন, এঁর কাছেই তাকে যেতে হবে। সাইকেল থেকে নেমে সে পায়ে হেঁটে মহাপুরুষ যেখনে বসে সেইদিকে চলতে থাকল, নিকটে এসে জুতো খুলে সাইকেল রেখে সে মহাপুরুষের কাছে গিয়ে তাঁকে

প্রণাম করলে। মহাপুরুষ তাকে বসতে বললেন। এরপর দুই-তিন ঘণ্টা ধরে দুই জনের, মাঝে অত্যন্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত কথাবার্তা হ'ল।

কথাবার্তা শেষ হবার পর মহাপুরুষ বললেন, কেদার তোমার মা তোমার জন্যে ভাবছেন, এবার তুমি বাড়ি যাও।—এই বলে মহাপুরুষ তাঁর নিজের হাতটা একটু নাড়তেই কেদার তার বাড়ি ঘর দোর মা বোন—সব কিছুই তার চোখের সামনে দেখতে পেল, মা বোনের কথাবার্তাও সে—শুনতে পেল।

কেদার বিস্মিত হয়ে মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা এখন কোথায় ?

মহাপুরুষ বললেন, আমরা এখন এমন জায়গায় যেখান থেকে বিশ্বের যে কোন জায়গা একেবারে কাছে দেখতে পাওয়া যায়। এই বলে মহাপুরুষ আর একবার হস্ত-সঞ্চালন করতেই আগের দৃশ্য কেদারের সামনে থেকে অপসৃত হয়ে গেল।

এরপর কেদার মহাপুরুষকে বললে, আপনি যে পাথরটার 'পর বসে আছেন ওর নীচের কি রয়েছে ?

কেদারের কথা শুনে মহাপুরুষ একটু হেসে হাত নাড়তেই পাথর-খানা অমনি সরে গেল, কেদার সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে ওর নীচে অলৌকিক দৃশ্যময় এক বিরাট আকাশ,—অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র তাঁতে নিরন্তর ঘুরছে। কেদারের তখন মনে হতে লাগল—এই মহাপুরুষ তা হ'লে ত দেখছি ব্রহ্মাণ্ডের উপরের এক ছেঁদার উপর আসলে বসে রয়েছেন! বিস্ময়ানন্দে রোমাঞ্চিত কেদার গিয়ে মহাপুরুষকে প্রণাম করলো। মহাত্মা আর একবার হাত নাড়তেই প্রস্তরটি আবার যথাস্থানে এসে গেল।

কেদার এবার মহাপুরুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হ'ল। জুতো পরে সাইকেলটি হাতে নিয়ে সে আগেকার রাস্তা ধরেই চললো। সে ভেবেছিল ময়দানের পথ ছাড়লেই সে বিশ্বেশ্বর গঞ্জে এসে যাবে। ময়দানের পথ শেষ হ'ল কিন্তু এ কি—সে এলাহাবাদ রোডে এসে পড়েছে! কাছেই সন্ত কবীরের জন্মস্থান

লহরতারার অন্তর্গত কবীরজীর মঠ। জায়গাটা যে বিশ্বেশ্বর গঞ্জ থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে। এখানে সে কি করে এল বুঝতে পারলে না কেদার কিছুতেই। গিয়েছিল সে পূর্ব দিকে আর ফিরল সে পশ্চিম দিক থেকে। আশ্চর্য!

পরের দিন ডক্টর কবিরাজের কাছে কেদার যখন ঘটনাটার বিবরণ দিল তখন সে তাঁকে ঠিক বুঝাতে পারল না ব্যাপারটা আর তা ছাড়া যে জায়গায় ঐ মহাত্মাকে সে ঐ অবস্থায় দেখেছে সেটা যে কাশীর কোন দিকে কত দূরে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারনাও সে করতে পারে নি।

এরপর আরও কয়েকবার সে ঐ মহাত্মার সঙ্গলাভ করেছে,– মিলন স্থান ঐ এক হ'লেও ঐ স্থানে যাবার—এবং ওখান থেকে ফেরবার পথ প্রতিবারই পৃথক। দূরত্বও যেন প্রতিবারেই বিভিন্ন। শেষের দিকে এমন হয়েছিল যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই—সেই ময়দানের কেন্দ্রে অবস্থিত সেই সিদ্ধাসন কেদারের নয়ন গোচর হ'ত।

সিদ্ধাসনের ধর্মই এই যে এ যে কোন সময় যে কোন জায়গায় দেখা দিতে পারে। জাগতিক বিচারে এ লৌকিক বলে প্রতীয়মান হ'লেও বাস্তবিক পক্ষে এ অলৌকিক। যে সিদ্ধ পুরুষের আসন এ তাঁর ইচ্ছায় কারো কাছে এটা কোন স্থানের অংশ বলে প্রতীত হতে পারে বটে কিন্তু মূলতঃ এ অখণ্ড, অবিভাজ্য। লৌকিক জগতে যে কোন স্থানে এ আসন দৃষ্ট হতে পারে যদি ওর অধিষ্ঠাতা কাউকে আকর্ষণ করেন বা দেখা দিতে চান। লৌকিক দেশ কালের সঙ্গে এ এমন ভাবে যুক্ত হয়ে থাকে যে দুইয়ের মাঝে কোন ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যায় না। এ স্থূলও নয় আবার সূক্ষ্ম নয়। স্থূল-সূক্ষ্ম দুই-ই।

কেদার যখন ঐ সিদ্ধ পুরুষের সঙ্গে দেখা করতে যেত তখন সে তার স্থূল দেহ নিয়েই যেত এমন কি বাস্তব জগতের সাইকেলটিও তার সঙ্গে থাকত। লৌকিক বোধ নিয়ে সাধারণ লোক যেমন কোন প্রিয়জন বা মাননীয় ব্যক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় দেখা করতে যায়—ঠিক তেমনি করেই কেদার যেত সেই সিদ্ধ মহাপুরুষের কাছে,

সূক্ষ্ম শরীরেও নয়, অথবা ধ্যানাবস্থা বা স্বপ্নাবস্থায় নয়।

এই ধরণের সিদ্ধ ভূমি আমাদের লৌকিক স্থানের অতীত বলে যে কোন জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে লৌকিক জগতের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করতে পারে, আবার দরকার হলে অন্যত্র সরে যেতেও পারে। বাস্তব জগতের কোন উপায়ে এ তত্ত্ব নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সিদ্ধ আসনের অধিষ্ঠাতা ইচ্ছা করলে যে কোন সময় যে কোন জায়গায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

সিদ্ধভূমির এই মাহাত্ম কেদার ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পেরেছিল, পূর্ণ উপলব্ধির পর তার অবস্থা এমন হয়েছিল যে সে যে কোন সময় যে কোন প্রদেশে বা লোকে গিয়ে উপস্থিত হতে পারত। বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত মহাপুরুষের অপার অনুগ্রহের ফলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছি

ডক্টর কবিরাজের সঙ্গে পরিচিত হবার পর কেদার মাত্র ছয় সাত বৎসর জীবিত ছিল, কিন্তু এই কয় বৎসরের মাঝেই তার অলৌকিক জীবনে এত বেশি পরিবর্তন হয়েছিল, এত কিছু ব্যাপার ঘটেছিল যে— কবিরাজজী বলেছেন—তার বিবরণ দিতে গেলে একখানা পুস্তক লেখার প্রয়োজন হয়। কেদারকে কবিরাজজী যেমনটি দেখেছেন তাতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে সে পূর্বজন্মেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল, বিশেষ কোন কারণে তাকে আবার মর্ত্যলোকে জন্ম নিতে হয়েছিল। মর্ত্যে স্থূল দেহ ধারণ করে নিজের যা করতে বাকী ছিল তা করে সে আবার তার পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে ফিরে গেছে। পার্থিব কোন মালিন্য তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক অনুভূত উপলব্ধ সত্য কেদার কবিরাজজীর কাছে প্রকাশ করেছে, ডক্টর কবিরাজ তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, পাঠকের অবগতির জন্য আমরা শুধু তার দুই একটির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি এখানে—

আধ্যাত্মিক সাধনায় বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে প্রথমে সাধকের তৃতীয় নেত্র খোলে, তারপর খোলে দিব্য নেত্র। তৃতীয় নয়ন খুলবার পর ধ্যানে বসলে নিজের ইচ্ছা মত দেবতার দর্শন অর্থাৎ ইষ্ট

দর্শন হয়। এই নয়ন খুলবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্তরে যে নারায়ণের অধিষ্ঠান তাঁরও দশন হয়। মাথা একটু নীচু করলেই দর্শন লাভ হয়—ইচ্ছা অনিচ্ছার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। দিব্য নয়ন খুলে যাবার পর ধ্যানেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। তখন যে কোন সময় যে কোন দেবতার দর্শন লাভ করতে পারা যায়।

সকল লোকের তৃতীয় নয়ন নেই, সকল দেবতারও নেই। যে লোকের তৃতীয় নয়ন আছে,—ঠিক মত-সাধনা করলে সে তার বিকাশ ঘটাতে পারে। এই নয়ন থাকলেও সাধনার দ্বারা বিকাশের সুযোগ না পেলে ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে যায়। শিব ও দুর্গার এই তৃতীয় নয়ন আছে—এ কথা সকলেরই জানা।

তৃতীয় নয়ন খুললেও প্রথমে কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না। প্রথমটায় শুধুমাত্র একটা জ্যোতি চোখে পড়ে, তারপর ঝাপসা ঝাপসা ভাবে কিছু দর্শন ঘটে, এরপর দিব্যচক্ষু খুললে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

কেদার বলেছে তার দিব্যনেত্র খুলবার আগে তার পিতার গুরুদেব রসিকবাবু সুস্থ শরীরে এসে তার চোখের সামনে একবার করসঞ্চালন করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে থেকে মেঘ বা কুয়াশার মত যে আবরণ ছিল তা সরে গেল। দিব্য দৃষ্টি খুলবার সঙ্গে সঙ্গে সে জগতের আদিগুরু ব্রহ্মাকে দেখতে পেল। এই আদিগুরুর যিনি গুরু তাঁকে বলা হয় অনাদিগুরু।

মৃত্যুর পর দেহ থেকে বেরিয়ে বিদেহী আত্মা লোক-লোকান্তরে যায়। সব লোকে যাওয়ার অবশ্য প্রয়োজনও নেই, অধিকারও নেই। দেহত্যাগের পর পিতৃলোকে একবার সকলকেই যেতে হয়। এই লোকের এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—যে কোন দিক থেকে এসেই এখানে ঢুকবার দ্বার পাওয়া যায়। পিতৃলোকের উপরে স্বর্গ, তার উপরে ইন্দ্রলোক, এরপর পরপর ঊর্ধ্বে কৈলাস ধ্রুবলোক-প্রভৃতি। সবার উপরে ইন্দ্রপুরী বা গোলোক।

ইন্দ্রপুরী প্রকৃতই দিব্যানন্দধাম। এখানে গেলে আর ফিরে

আসতে ইচ্ছা করে না। মৃত্যুর পরে পিতৃলোকে প্রথমে সবাইকে যেতে হয়।

কেদার বলেছে সে যখন ইন্দ্রপুরী থেকে ফিরে আসত তখন তার ঘরের কাছে এসে উপর থেকে তার নিজের দেহটা দেখতে পেত, আশে পাশে যে সব লোক থাকত তাদেরও দেখতে পেত, তাদের কথাবার্তা শুনতে পেত, কিন্তু বুঝতে পারত না কিছু। দেহে প্রবেশ না করলে কিছু বুঝতে পারা যায় না।

# মহাত্মা জ্যোতিজী

জ্যোতিজীর আগের আসল নাম কি ছিল তা আমরা জানি না, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ কাশীধামে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। তিনি তার সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ গ্রন্থে এই মহাত্মার বিস্তৃত বিবরণ দিলেও তাঁর আসল নামটি গোপন করে গিয়েছেন। মহাত্মাকে জ্যোতিজী আখ্যা দেবার কারণ ইনি 'সাধনা ও কর্মে মিলন' নামে যে একখানি তত্ত্বহুল গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন, নিজের আসল নাম গোপন করে 'জ্যোতিঃ' নামে আত্মপরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

প্রসিদ্ধ দুই থিয়সফিষ্ট—আনি বেদান্ত ও নেডবিটার জ্যোতিজীকে সূক্ষ্মশরীরে আকাশপথে সঞ্চরণ করিয়ে তাঁর দ্বারা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করাতেন। জ্যোতিজী পূর্বজন্মের সাধনার ফলে এবং এক মহাপুরুষের কৃপায় বাল্যকালে স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম-দেহে বিচরণ এবং নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের কয়েকটি অলৌকিক কাহিনী শুধু এখানে বিবৃত করা হচ্ছে—

শ্রীহট্টের মৌলবী বাজারের কালীবাড়িতে এক অপরূপ সুন্দর যুবক সন্ন্যাসী এসেছেন। জ্যোতিজীর বয়স তখন বারো কী তেরো। তিনি ওখানকার ইংরেজী ইস্কুলে পড়েন। সন্ন্যাসী রোজ সন্ধ্যায় মন্দিরে তন্ময় হয়ে মধুর কণ্ঠে ভজন গান। তাঁর দিব্য সুরে আকৃষ্ট হয়ে আশে পাশের বহু লোক তাঁর ভজন শুনতে মন্দিরে আসেন। বালক জ্যোতিজীও আসেন। বয়স অল্প বলে তিনি সকলের পিছনে বসে দিব্য ভাবোদ্দীপ্ত সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে এক মনে তাঁর গান শোনেন। গান শেষ হ'লে আর সবাই যখন চলে যায়, তখনও তাঁর উঠতে ইচ্ছা করে না। এই সন্ন্যাসী কেন যেন তাঁকে চুম্বকের মত টানেন। বালক জ্যেতিজীর কেবলি মনে হয়—এই সন্ন্যাসী যেন তাঁর বড় আপন জন,—পূর্ব পরিচিত এবং বহু পরিচিত। বালকের বাড়ীটা বেশ কিছুটা দূরে, রাত্রির অন্ধকারে সে একা কি করে ফিরবে সে চিন্তা তার মনে আসে না, মন্ত্রমুগ্ধের মত সন্ন্যাসীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে সে বসেই থাকে।

আর সবাই চলে গেল, তুমি গেলে না যে? বালকের মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন সন্ন্যাসী।

এ কথার কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বালক বললে, হ্যাঁ এবার যাব,—কিন্তু যেতে ইচ্ছা করছে না।

সন্ন্যাসী বললেন, খোকা তুমি তোমার নিজের কথা সব ভুলে গেছ: তুমি কে, কোত্থেকে এসেছ, কেন এসেছ—কিছুই মনে নেই তোমার। এখানে আমার কাছে থাকতে তোমার কেন ভাল লাগছে তাও তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু একদিন বুঝবে। তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ তা তোমার জানা নেই বটে, কিন্তু আমি জানি। পূর্বের কথা সবই তুমি ভুলে গেছ কিন্তু আমি ভুলি নি। তোমার জন্যই আমার এখানে আসা। ভজন গান করে ধর্ম কথা বলে লোক আকর্ষণ করা। এ সবই বাহ্য,—আসল ব্যাপার তুমি। যা'ক—রাত হয়েছে, আজ ঘরে ফিরে যাও, কাল আবার এসো।

পরদিন বালক আবার এল, তার পরের দিনও এল, এমনি করে কয়েকদিন যাতায়াতের পর—একদিন যখন ভজন শেষ হবার পর আর

সবাই চলে গেছে বালক তখন বসেই রয়েছে, তখন তাকে একা পেয়ে সন্ন্যাসী বালককে বললেন, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, তিনি কি আছেন, থাকলে তিনি কেমন, কি তাঁর স্বরূপ তোমার মনে হয় ?

বালক উত্তরে বললে ঈশ্বর আছেন, এ আমি অবশ্য বিশ্বাস করি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী—এ সবই ঈশ্বরেরই মূর্তি বলে মানি, শুনেছি তাঁর অনন্ত রূপ। এর বেশি ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই।

বারো তেরো বছরের একটা ছেলের কাছ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে এর বেশি কি-ই বা আশা করা যেতে পারে ?

সন্ন্যাসী বললেন, তোমার মুখে এ কথা শুনে আমি খুশী হতে পারলাম না। ঈশ্বর তত্ত্ব প্রত্যক্ষ না করলে উপলব্ধি না হ'লে সে সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণা হওয়া অসম্ভব। আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি একটু স্থির হয়ে বসো, আমি তোমায়-এ রহস্যের একটু আভাস দেখাচ্ছি।

এই বলে সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলেন। বালক জ্যোতিজীও তাঁর কাছে স্থির হয়ে বসে। একটু পরেই জ্যোতিজী হঠাৎ দেখলেন আকাশ থেকে কি একটা জ্যোতির্ময় পদার্থ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর সঙ্গে যেন একেবারে মিশে গেল, এক হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্বচনীয় অভূতপূর্ব আনন্দে যেন তাঁর সারা সত্তা আপ্লুত হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজের যে সত্তাকে এত-দিন 'আমি বলে ভেবে এসেছেন'—তা যেন আর রইল না। আর এই আমিত্বের লোপের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এমন একটা অদ্ভুত অপূর্ব অনুভূতি জাগল যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ঃ তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেদিকেই দেখেন যেন আমি রয়েছি সেখানে। ছোট বড় যে কোন জীব, গাছপালা—যে কোন কিছুর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে—তাতেই রয়েছে যেন তিনি। তখন তিনি দেখতে লাগলেন, উপলব্ধি করতে লাগলেন—তাঁর সেই নিজের 'আমি' অনন্ত 'আমি' হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে পশু পাখী, কীট পতঙ্গ, তরুলতা সব কিছুতে।

এই সময় মন্দিরে হঠাৎ কোত্থেকে একটা বেড়াল এসে হাজির হ'ল। বেড়ালটা হয়ত—দেবতার ভোগের জন্য যে দুধ রাখা হয়েছিল

তার লোভেই এসেছিল। কিন্তু তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই জ্যোতিজী স্পষ্ট অনুভব করলেন—তিনি নিজেই যেন সেই বেড়াল। এই অনুভূতিতে জ্যোতিজীর মনে হ'ল তাঁর হয়ত মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে এই ভেবে তিনি বিড়ালকে স্পর্শ করতে গেলেন। কিন্তু এ কি বিড়ালকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখেন বিড়াল ত আর নেই, তিনি নিজেই যে এক বিড়াল। মানুষের দেহের সকল ভাবই তখন তাঁর ঢাকা পড়ে গেছে। জেগে উঠেছে মনে বিড়ালের বাসনা সংস্কার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি।

এ অবস্থা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, কিছুক্ষণ পরেই তার পূর্বাবস্থা ফিরে এল, বুঝলেন তিনি একটা মানুষ, বারো বছরের ছেলে তিনি একটি, সন্ন্যাসীর গানে আকৃষ্ট হয়ে সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে এসেছেন।

সন্ন্যাসী তখন তাঁর অবস্থা দেখে মৃদুমৃদু হাসছেন: বুঝলে এবার—ঈশ্বরতত্ত্ব কি? ঈশ্বর দর্শন মানে আত্মদর্শন, সব কিছুর মাঝে নিজেকেই অর্থাৎ নিজের আত্মাকেই দেখতে পাওয়া।

০ ০ ০

সন্ন্যাসী একদিন বালক জ্যোতিজীর সূক্ষ্ম দেহ আকর্ষণ করে—এস ত আমার সঙ্গে! এই বলে ঐ অদ্ভুত সন্ন্যাসী শূন্য মার্গে চলতে শুরু করলেন, আর জ্যোতিজীও আকাশ-সন্ন্যাসীর পিছু পিছু চলতে লাগলেন, স্থূল দেহটি তাঁর তখন ঐ মন্দিরেই পড়ে রইল।

কিছুক্ষণ চলবার পরই জ্যোতিজী দেখেন তাঁরা এমন এক জায়গায় এসে গেছেন যার চারিদিকেই পাহাড়। জায়গাটি বড় সুন্দর। জ্যোতিজীর মনে হ'ল এ হিমালয়েরই কোন নিভৃত স্থান। ওখানেই দেখলেন তিনি একটি আশ্রম, সেই আশ্রমে একটি মন্দির এবং মন্দিরে একটি প্রস্তর নির্মিত কালী মূর্তি।

এই সব দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতিজীর পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে পড়ল। মনে পড়ল—এইখানেই তিনি একদিন ছিলেন। কতদিন কি ভাবে ছিলেন, এই সন্ন্যাসীই বা কে আর কেনই বা তিনি এ স্থান থেকে চ্যুত হয়েছেন—ধীরে ধীরে সব কিছু তাঁর মনে পড়তে লাগল।

মনে পড়ল সাধন জীবনে এক সন্ন্যাসীর প্রতি অন্যায় আচরণ করায় তাঁকে ঐ স্থান ভ্রষ্ট হয়ে সাধারণ লোকালয়ে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। আবার ঐ সন্ন্যাসীও তার পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য লোকালয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। বলা বাহুল্য মৌলবী বাজারের কালীবাড়ীর ঐ সন্ন্যাসী সেই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী জাতিস্মর তা পূর্বজন্মের সব কথা মনে থাকায় তিনি জ্যোতিজীকে উদ্ধার করতে এসেছেন।

জ্যোতিজী পূর্বজন্মে যে আশ্রমে থেকে সাধনা করতেন তা দেখানোর পর সন্ন্যাসী তাকে আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনলে জ্যোতিজীর সূক্ষ্ম দেহ তাঁর স্থূলদেহে প্রবিষ্ট হ'ল, এবং সূক্ষ্ম শরীরে তিনি যা সব দেখে এলেন তা সব স্মরণ করতে লাগলেন। মৌলবী বাজারের মন্দিরে ফিরে এসে সন্ন্যাসী জ্যোতিজীর দিক চেয়ে মৃদু হাসতে লাগলেন। জ্যোতিজীর বুঝতে বাকী রইল না—এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর কি নিগূঢ় সম্বন্ধ। মুখে কিছু না বলে এই কৌশলেই সন্ন্যাসী জ্যোতিজীর কাছেই আত্মপরিচয় দিয়ে দিলেন।

জ্যোতিজী এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর স্থায়ী আবাস জানতে চাইলে সন্ন্যাসী বলেছিলেন, সে সব কিছু তোমার জানবার দরকার নেই, শুধু এইটুকু জেনে রাখো—তোমার যখনই কোন প্রয়োজন হবে তখনই তুমি আমার দেখা পাবে। মানে স্থূল দেহ থেকে বেরুবার ইচ্ছা জাগলেই তুমি আমাকে স্মরণ করো, তা হ'লে আমার শক্তি তোমার মাঝে কাজ করবে, এবং ঐ শক্তির আশ্রয়ে তুমি সূক্ষ্ম শরীররে লোক লোকান্তরে পরিভ্রমণ করতে পারবে।

° ° °

উক্ত মহাপুরুষকে স্মরণ করে তাঁর সাহায্যে জ্যোতিজী অবশ্য ঐ ছেলেবেলা থেকেই স্থূলদেহ ছেড়ে সূক্ষ্মদেহে নানাস্থানে নানা লোকে গিয়ে অনেক অদ্ভুত কিছু দেখেছেন, কিন্তু তাতে তাঁর মনের ক্ষুধা মেটে নি। পূর্ব-জন্মের সাধন বলে তিনি উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ, প্রাণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভগবদ্দর্শন, আত্মোপলব্ধি, তাই পনের-ষোল বৎসর

বয়সেই তিনি সন্ন্যাস নেবার বাসনায় ঘর ছেড়ে বেরোন। এই সময় জ্যোতিজীর যে দিব্যদর্শন ঘটেছে তার দুই একটি শুধু এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

প্রথমে তারকেশ্বরের ছোট ঘটনাটির কথাই বলা যাক। সন্ন্যাসী হবার বাসনা নিয়ে তারকেশ্বরে এসে পড়ছেন জ্যোতিজী। বিগ্রহ দর্শন করতে গঙ্গাস্নান করে পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে ঢুকেছেন জ্যোতিজী। কিন্তু কই,—কোথায় বাবা তারকনাথের লিঙ্গমূর্তি? তিনি দেখলেন দেবতার পাষাণ মূর্তিটি ঢেকে বেনারসী শাড়ী পরা অপরূপ সুন্দরী এক মহিলা সেখানে বসে রয়েছেন, আর একটু দূরে মন্দিরের এক কোণে ছায়ার ন্যায় এক শিবমূর্তি।

এই অলৌকিক দর্শন অবশ্য জ্যোতিজীর মাত্র দুই তিন মিনিটের জন্য হয়েছিল, এরপরে পাণ্ডাঠাকুরের তাগিদে নিজের হাতের ফুল বেলপাতা—এবং দুধ তিনি শিবের লিঙ্গমূর্তির উপরেই ঢেলে দিলেন।

ঐ সময়েই আরেকটি অলৌকিক দর্শন ঘটে ত্রিবেনীতে। জ্যোতিজীর এক সমবয়সী বন্ধু তারই সঙ্গে সন্ন্যাস নেবেন কথা ছিল। বন্ধুটি তারকেশ্বরে এসে তার সঙ্গে মিলিত হবেন। কিন্তু কই তিনি? জ্যোতিজী তখন তাঁর সেই মহাপুরুষ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা—সূক্ষ্মদেহের সাহায্যে জানলেন বন্ধু ত্রিবেণী গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ট্রেনের টিকেট কেটে ত্রিবেণী এলেন জ্যোতিজী, রাত তখন বারোটা। এক অপরিচিত ভদ্রলোককে সঙ্গী পেলেন তিনি। ভদ্রলোক ত্রিবেণীতে পুণ্য স্নান করতে এসেছেন। দুই পয়সার দুটো খাটিয়া ভাড়া করে রাত কাটালেন দু'জন এক গৃহস্থের বাড়িতে।

ভোরে জ্যোতিজী খোঁজ নিয়ে জানলেন বন্ধু সন্ন্যাসের সংকল্প ত্যাগ করে ত্রিবেণী থেকে কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গিয়েছেন। জ্যোতিজীর অবস্থা হ'ল নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গ। এই ত সন্ন্যাস।

ত্রিবেণী জায়গাটা বড় ভাল লাগল জ্যোতিজীর। হাতে পয়সা নেই—দু'দিন দু'রাত্রি মুড়ি আর গঙ্গা জল খেয়ে কাটালেন। সঙ্গী ভদ্রলোকটি একদিন তাঁর সঙ্গে থেকেই চলে গিয়েছেন।

তৃতীয় দিন শেষ রাত্রে ভোর হবার একটু আগে শুয়ে আছেন জ্যোতিজী, ক্ষুধার জ্বালায় এবং নানা উদ্বেগে ঘুম অনেক আগেই ভেঙে গেছে, তবু চোখ বুজে পড়ে আছেন—সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। এমন সময় কানে এল এক স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। স্ত্রীলোকটি জ্যোতিজীর পিতৃদত্ত নাম ধরে ডাকছেন। শুনে চোখ মেললেন জ্যোতিজী, দেখলেন স্ত্রীলোকটি পরণে একখানা কাল রঙের শাড়ী, হাতে সোনার রেকাবি ও থালা—দিব্য লাবণ্যময়ী মূর্তি, মনে হচ্ছিল তার দেহ থেকে যেন আলো ঠিকরে বেরিয়ে চারিদিক আলো করে তুলছে। স্নিগ্ধ আলো, কিন্তু এত তীব্র যে জ্যোতিজী তা সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে দুই হাতে দুই চোখ ঢেকে রাখলেন। এ সত্বেও জ্যোতিজী অনুভব করলেন তার নিজের ভিতর থেকেই যেন আলো বেরিয়ে আসছে।

মহিলা পরম স্নিগ্ধ কণ্ঠে জ্যোতিজীকে বললেন, গঙ্গায় স্নান করবে না এবার ?

মহিলার এই কথা শুনে জ্যোতিজী চোখ একটু ফাঁক করে দেখেন মহিলা পাশের বাগান থেকে ফুল আর তুলসীপাতা তুলছেন।

মহিলা আবার বললেন, কই উঠলে না, গঙ্গাস্নান করবে না ?

জ্যোতিজী বললেন, আমাদের দেশে গঙ্গাস্নান করতে গেলে তিল, হরতকী, ধূপ ইত্যাদির দরকার হয়। এই বলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিজী মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখেন তার থালায় তিল, হরতকী, ধূপ, দীপ সবই সাজানো আছে।

মহিলা এবার মৃদু মৃদু হেসে জ্যোতিজীকে বললেন, এখানে এসেছ কেন ? আমি ত সব জায়গায় সকলের ভিতরেই আছি।

জ্যোতিজীর নিজের ভিতর থেকেই তখন এক অদ্ভুত দিব্য মধুর শব্দ শুনছিলেন। জগতের কোন কিছুর উপমা দিয়ে এ ধ্বনির মাধুর্য বুঝানো যায় না।

মহিলা এবার জ্যোতিজীকে বললেন, একবার হাঁ কর তো।

মহিলার কথায় জ্যোতিজী হাঁ করলে তার মুখ আর কানের ভিতর দিয়ে এ ধ্বনি আরও জোরে স্পষ্ট হয়ে বেরুতে লাগল। মহিলা

বললেন, আমি ঐ ধ্বনির পিছনে জ্যোতিরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছি। এই বলে মহিলা ধীরে ধীরে গঙ্গার দিকে এগুতে লাগলেন, জ্যোতিজীকে বললেন তার সঙ্গে যেতে। মন্ত্রমুগ্ধের মত জ্যোতিজী তার পিছু পিছু চললেন।

স্নান ঘাটের পাশেই এক শ্মশান। সেখানে গিয়ে মহিলা জ্যোতিজীকে বললেন, হাঁটু গেড়ে বসো। মহিলার কথায় জ্যোতিজী তেমনি করে বসলে মহিলা তার মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি বাড়ী ফিরে যাও, আমি তোমাদের মন্দিরে থাকব। তোমার মা তোমার জন্য পাগলের মত ছটফট করছেন। বাড়ী যাও।

মহিলা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিজী তাঁর মাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

জ্যোতিজী বললেন, আমি কাশীতে যাব।

উত্তরে মহিলা বললেন, কি হবে তোমার সেখানে গিয়ে ? তোমার কত আত্মীয়স্বজন ত কাশীতে গেছেন ? কি হয়েছে তাঁদের সেখানে গিয়ে ? কোন লাভ হয়েছে ?

এই বলেই মহিলা কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

# রামপ্রসাদ

আগের দিন হালি সহরে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে। ফলে রামপ্রসাদের মেটে ঘরের বেড়া গেছে ভেঙে। অর্থের অনটন, সুতরাং মজুর ডেকে বেড়া মেরামত করা সম্ভবপর নয়। মেরামত দেরী করাও চলে না, খোলা ঘরে শুতে হয়, তাই রামপ্রসাদ নিজেই বেড়া মেরামত করতে শুরু করেছেন, সাহায্য করছে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরী। রামপ্রসাদ ঘরের ভিতরে, মেয়ে বাইরে। বাইরে থেকে সে বাপের হাতে দড়ির গিঁট ফিরিয়ে দিচ্ছে। এমনি করে চলছে বেড়া বাঁধা।

রামপ্রসাদ আত্মভোলা মাতৃপ্রেমিক, মায়ের উদ্দেশে স্বরচিত গান গাইছেন আর বেড়ায় বাঁধন দিয়ে যাচ্ছেন। মেয়ের বয়স অল্প, চঞ্চলা। কি খেয়ালে সে বাবাকে কিছু না বলেই বেড়ার ওখান থেকে চলে গেছে। ক্ষিধে পেয়েছিল বুঝি তাই স্নান করে খাওয়া দাওয়াও করেছে—তারপর হঠাৎ মনে পড়েছে,—আরে, অনেকক্ষণ ত বাবার বাঁধন ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, বকুনি খেতে হবে ত। এই ভেবে মেয়ে ছুটে এল বেড়ার কাছেঃ আরে, একি, ঘরের বেড়া ত প্রায় শেষ হয়ে এল, বাবার হাতে বাঁধন ফিরিয়ে দিল কে? রামপ্রসাদ তখনও মায়ের নামগানে মশগুল।

ও বাবা, বাবা?

কিরে?

বেড়া ত প্রায় শেষ হয়ে এল, তা তোমার বাঁধন ফিরিয়ে দিচ্ছিল কে?

কেন, তুই-ই ত দিচ্ছিলি!

না, না, আমি ত বহুক্ষণ ছিলাম না এখানে বাবা।

শুনে চমকে উঠলেন রামপ্রসাদঃ তবে?

পরক্ষণেই বুঝতে বাকী রইল না,—তাঁর আরাধ্যা দেবী জগদম্বাই

ভক্তের প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে কন্যারূপে তাঁর হাতে ঘরের বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন।

রামপ্রসাদ ধারা বিগলিত নেত্রে অমনি গান ধরলেন—

মন কেমন মায়ের চরণ ছাড়া
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া।
নয়ন থাকতে দেখলে না মন
কেমন তোমার কপাল-পোড়া
মা ভক্তে ছলতে তনয়া-রূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।

... .... ... ....

রামপ্রসাদ গঙ্গার স্নানে যাবার-উদ্যোগ করছেন, এমন সময় গৃহে এক অপরিচিতা নারী-এসে হাজির। তাঁর সুন্দর-সুঠাম শ্যাম তনু যেন দিব্য লাবণ্যে টলমল করছে। তিনি মধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদকে বললেন ; বাবা, তোমার মধুর কণ্ঠে মায়ের নামে যেন অমৃত ঝরে, তাই শুনতেই যে আমি এলাম, একটু গেয়ে শুনাও না বাবা !

কিন্তু বেলা তখন দুপুর মায়ের ভোগ-আরতির সময় হয়ে গেছে, রামপ্রসাদ আর দেরী করতে পারেন না, তাই তিনি অপরিচিতাকে বললেন, মা, তুমি একটু অপেক্ষা কর গঙ্গা থেকে ডুবটা দিয়ে এসেই তোমায় মায়ের গান শোনাচ্ছি। এই বলে রামপ্রসাদ স্নানে চলে গেলেন,—ফিরে এসে দেখেন সে অপরিচিতা চলে গিয়েছেন।

চণ্ডীমণ্ডপে মায়ের ভোগ আরতির পর রামপ্রসাদ ধ্যানে বসেছেন এমন সময় চোখের সামনে দেখেন আবার সেই অপরিচিতা। অপরিচিতা বীণা নিষ্যন্দী কণ্ঠ অনুযোগ করে বলছেন, বাবা, তোমার মধুর কণ্ঠে সুধামাখা মায়ের নাম শুনব বলে আমি সুদূর কাশী থেকে এলাম, আর তুমি একবার তা আমায় শোনালে না ?

বুকটা কেঁপে উঠল রামপ্রসাদের, দেহে রোমাঞ্চ হলো, ইনি যে সাক্ষাৎ জগদম্বা অন্নপূর্ণা ! হায় হায় কি করেছি আমি, কি ভুলই না

করেছি! উঠে তখনই ছুটলেন রামপ্রসাদ কাশীর পথে।

কিছুদূর যাবার পরই সামনে পড়ল ত্রিবেণী। একটু বিশ্রাম করে নিতে সবে ত্রিবেণীর ঘাটে বসেছেন এমন সময় আবার রহস্যময়ীর কণ্ঠস্বর: বাবা, এত কষ্ট করে কাশী ছুটার তোমার কি দরকার? আমি ত সর্বত্রই রয়েছি বিশেষ করে ভক্তদের হৃদয়ে। তোমার হৃদয়েই যে আমার অধিষ্ঠান। তুমি এখান থেকেই আমায় গান শোনাও—

মায়ের এই অশরীরী বাণী শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল রামপ্রসাদের অন্তর, তিনি তখনই ভক্তি গদগদ চিত্তে গান ধরলেন—

আর কাজ কি আমার কাশী
মায়ের চরণতলে পড়ে আছে
গয়া গঙ্গা বারানসী।
হৃৎ-কমলে ধ্যান কালে
আনন্দ সাগরে ভাসি
ওরে কালীপদ কোকনদে
তীর্থ রাশ রাশি।

———

# শঙ্করাচার্য

মহাযোগী গোবিন্দপদ স্বামীর শিষ্য শঙ্করাচার্য উত্তরাখণ্ড থেকে নেমে এলেন বেদান্তের অদ্বৈতবাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য। ভারতে তখন বৈদিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ যাগযজ্ঞেরই প্রচলন পূর্ণোদ্যমে। এই মতের সমর্থক আচার্যগণের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছেন সে যুগে প্রয়াগের কুমোবিল ভট্ট। শঙ্কর প্রথমে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আমি বেদান্তের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রচার করতে বেরিয়েছি, আপনি কর্মকাণ্ডের সমর্থক তা জানি। আপনার মত দিগ্বিজয়ীকে যদি আমার ব্যাখ্যা গ্রহণ করাতে পারি তা হ'লে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

শঙ্করের বয়স তখন মাত্র ষোল। এই বয়সের একটি ছেলের মুখে এই কথা শুনে ক্রোধে কুমাবিলের দুই নয়ন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, তাঁর শিষ্যগণ হলেন মহা উত্তেজিত। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কুমাবিল যখন শঙ্করের পূর্ণ পরিচয় পেলেন, তখন তাঁর মন নরম হ'ল, তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, তরুণ আচার্য তোমার উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত হবার সময় ত আর আমার হাতে নেই। ঐ দেখ তুষানল, প্রস্তুত আমি এখনি তাতে প্রবেশ করে দেহ-ত্যাগ করতে যাচ্ছি। তুমি বরং মাহিষ্মতী নগরীতে মণ্ডন মিশ্রের কাছে যাও। তিনি আমার প্রধান শিষ্য, কর্মকাণ্ডে আমার পরেই তাঁর স্থান। তাঁকে যদি বিচারে পরাস্ত করতে পার, তা হ'লে সে আমারই পরাজয় হ'ল বলে মনে করবে।

ভট্টপাদের কথা শুনে আচার্য শঙ্কর গেলেন মাহিষ্মতী নগরীতে। দাক্ষিণাত্যে মণ্ডন মিশ্রের তখন বিপুল খ্যাতি, দারুণ প্রভাব প্রতিপত্তি, কর্মকাণ্ডে একমাত্র ভট্টপাদ ছাড়া তাঁর মত আর দ্বিতীয় কেউ নাই। মণ্ডনের সুউচ্চ সৌধের পাশে যজ্ঞস্থল প্রাচীর বেষ্টিত, শঙ্করাচার্য গিয়ে দেখলেন—সেখান থেকে যজ্ঞের ধূম উঠছে। যজ্ঞশালার দ্বারে

প্রহরী। আচার্য শঙ্কর সেখানে প্রবেশ করতে চাইলে প্রহরীরা তাকে বাধা দিলে মহাযোগী গোবিন্দপাদের উপযুক্ত শিষ্য শঙ্কর যোগবলে শূণ্যে উত্থিত হয়ে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করলেন।

কে তুমি, কি চাই তোমার ?—প্রশ্ন করলেন বিরক্ত ক্রুদ্ধ মণ্ডন মিশ্র।

মহাযোগী গোবিন্দপাদ স্বামীর শিষ্য আমি, নাম শঙ্কর, উত্তরাখণ্ড থেকে এসেছি আমি, উদ্দেশ্য আমার সারা ভারতবর্ষে বেদান্তের অদ্বৈতাবাদ প্রচার করা, প্রতিষ্ঠা করা। বিচারে কর্ম্মকাণ্ডের সমর্থক। আপনাকে পরাস্ত করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বললেন তরুণ আচার্য।

অর্বাচীন উদ্ধত বালক, তুমি জান না, কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি।

জানি বেশ ভাল ভাবেই জানি, দাক্ষিণাত্যে কমকাণ্ড সমর্থকদের স্তম্ভস্বরূপ আপনি, তাই আপনাকে আমার ব্যাখ্যা ও মত গ্রহণ করাতে পারলেই সমগ্র ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। এইরূপ পরিকল্পনা নিয়েই গিয়েছিলাম আমি প্রয়াগে আপনার গুরু ভট্টপাদের কাছে, কিন্তু তিনি এখন দেহত্যাগে উদযোগী, অবসর নেই তাঁর বিচার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার, তাই পাঠালেন তিনি আমায় আপনার কাছে,—বললেন বিচারে আপনাকে হারাতে পারলে তাঁরই পরাজয় হবে।

শুনে ভাবতে হ'ল মণ্ডন মিশ্রের। মহাপ্রতিভাধর তরুণের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মণ্ডন মিশ্র বললেন, বেশ বিচার দ্বন্দ্বে আমি প্রস্তুত, কিন্তু বিচারে জয় পরাজয়ের পরিণতিটা হবে কি, যিনি হেরে যাবেন তাকে কি দণ্ড নিতে হবে সেটাও আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া দরকার।

শঙ্করাচার্য বললেন, এর সর্ত হচ্ছে এই যে বিচারে যিনি হেরে যাবেন তাঁকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। আপনি যদি হেরে যান তবে আমাকে গুরু করে চিরদিনের জন্য গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করে আপনি সন্ন্যাস নেবেন, আর আমি হেরে গেলে আমি আপনার শিষ্যত্ব স্বীকার করে চিরতরে আমার দণ্ড কমণ্ডলু ত্যাগ করব।

মণ্ডন আচার্য বললেন,—বেশ উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু আমাদের এ বিচার দ্বন্দ্বে কার পরাজয় হ'ল তা নির্ধারণে মধ্যস্থ হবেন কে?

তরুণ আচার্য উত্তরে বললেন, আপনার সহধর্মিণী উত্তর ভারতীয় দেবীর পাণ্ডিত্যের কথা আমি বহু জায়গা থেকে শুনে এসেছি, সুতরাং আমাদের এ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মধ্যস্থ হবেন তিনিই।

মণ্ডন মিশ্র হেসে বললেন, তরুণ আচার্য, তোমার এ প্রস্তাব আমি যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারছি না।

কেন, আচার্যদেব?

উত্তর ভারতী আমার সহধর্মিণী, আমাদের এ গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় জয় ঘোষণার বেলায় তাঁর সিদ্ধান্ত পক্ষপাত দুষ্ট হবার সম্ভাবনা।

না আচার্যদেব, তা হ'তে পারে না, লোকমুখে আমি তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি—তাতে বুঝেছি শুধু বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যে নয়, সত্যনিষ্ঠায়ও তিনি অতুলনীয়া,—সুতরাং আমি চাই তিনিই আমাদের মধ্যস্থা হ'ন।

তাই হ'ল মণ্ডন মিশ্র আর শঙ্করাচার্যের বিচার দ্বন্দ্বে মধ্যস্থা হ'লেন উত্তর ভারতী দেবী। যথা সময়ে বিতর্ক সুরু হ'ল, চললো তা আঠারো দিন ধরে। বিচার দ্বন্দ্বে শঙ্করের অদ্বৈতবাদেরই জয় ঘোষিত হ'ল। বৈদিক কর্ম কাণ্ডের সমর্থক মহা পরাক্রান্ত আচার্য মণ্ডন মিশ্র পরাজয়ে দক্ষিণ দেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। বিজয়ানন্দে তরুণ আচার্য শঙ্করের মুখ উদ্দীপ্ত, তিনি এবার এগিয়ে গেলেন মণ্ডন মিশ্রকে গার্হস্থ্য ছাড়িয়ে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করতে।

বাধা দিলেন উত্তর ভারতী দেবী: থামুন, আচার্য, থামুন, বিতর্কে আপনি আমার স্বামীকেই পরাস্ত করেছেন—আমাকে এখনও করেন নি। শাস্ত্রমতে আমি তাঁর অর্ধাঙ্গিনী সুতরাং বিজয় আপনার পূর্ণাঙ্গ হয় নি, হয়েছে মাত্র অর্ধেক, বিতর্কে আমাকে যদি আপনি পরাজিত করতে পারেন তবেই আমার স্বামীর পরাজয় হ'ল মেনে নেওয়া যাবে। আমি আপনাকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করছি।

কথাটার মাঝে কতটা যুক্তি আছে সে কথা আর ভেবে দেখলেন না

শঙ্কর, উত্তর ভারতী দেবীকে তর্কে পরাস্ত করতে পারলে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার সকল বাধা তাঁর অপসারিত হবে ভেবে তিনি বললেন, দেবী আপনার সঙ্গে বিতর্কে আমি রাজী,—কিন্তু কি শাস্ত্র নিয়ে আমাদের বিতর্ক হবে—জানতে পারি কি ?

উত্তর হল,—কামশাস্ত্র।

কামশাস্ত্র!—শুনে চমকে উঠলেন শঙ্কর। আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী তিনি, কামশাস্ত্র নিয়ে বিতর্কে তিনি কি করে অবতীর্ণ হবেন ? তত্ত্বের দিক দিয়ে জ্ঞানার্জন সম্ভব হলেও ব্যবহারিক দিক আছে না ? কিন্তু রাজী যখন হয়েছেন তখন পিছিয়ে আসাও ত চলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বললেন একমাস সময় চাই আমি।

উত্তর ভারতী দেবী বললেন, তথাস্তু।

সময় ত পাওয়া গেল, কিন্তু কি করে এর ব্যবহারিক দিকের জ্ঞান আহরণ করা যায় ?—ভাবতে লাগলেন শঙ্কর, ভেবে ভেবে দেখলেন,—একমাত্র পরকায়াপ্রবেশ ছাড়া এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। শিষ্যদের বললেন, খোঁজ তোমরা, খুঁজতে থাক—কোন বিবাহিত যুবক অনতিপূর্বে প্রাণত্যাগ করেছে কি না।

বেশিদিন খুঁজতে হ'ল না, দু এক দিনের মাঝেই দেখা গেল বনের মাঝে পুষ্পমাল্য শোভিত এক শব আনা হয়েছে দাহ করতে, পাশেই তার চন্দনকাষ্ঠের স্তূপ আর অনেক লোকজন।

কি ? কি ?—না, স্থানীয় রাজা অমরুক মারা গেছেন—অতি অল্প বয়সেই।

শিষ্যেরা খবরটা এনে দিতেই শঙ্করাচার্য বলে উঠলেন, ঠিক আছে, আমি এই রাজার দেহে প্রবেশ করবো, জ্ঞান লাভ করার পর উত্তর ভারতী দেবীকে বিচারে পরাস্ত করে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এই পরিত্যক্ত দেহটা নিভৃত কক্ষে রেখে সতর্ক পাহারা দেবে, বাইরের কেউ যেন এর কাছে না আসে।

এই বলেই আচার্য শঙ্কর নিজের দেহ থেকে বেরিয়ে মৃত রাজার কায়ায় প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বনে রাজার শবদাহ করতে যারা

এসেছিল তারা দেখলে—তাদের রাজা চোখ মিলে চাইছেন, বক্ষস্থলও স্পন্দিত হচ্ছে।

আরে, আরে, আমাদের রাজা যে বেঁচে উঠেছেন।—চারদিকে অমনি আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। এরপর মহানন্দে, মহাসমারোহে রাজাকে তাঁর প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

এদিকে রাজা পুনরুজ্জীবিত হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন বটে, মন্ত্রী এবং সভাসদেরা তার বিচারবুদ্ধি এবং আচরণে যেন বেশ একটু তারতম্য লক্ষ্য করতে লাগলেন। এদিক দিয়ে তিনি যেন তাদের সেই আগের রাজা ন'ন। ইনি যেন কোন মহাপ্রতিভাধর কোন পুরুষ। আগের রাজার মত কূটবুদ্ধিরও তার মাঝে অভাব।

দেখে দেখে বিচক্ষণ মন্ত্রীর সন্দেহ হ'ল : আমাদের রাজার মৃতদেহে সূক্ষ্ম শরীরের কোন শুদ্ধসত্ত্ব যোগী প্রবেশ করেন নি ত।—লোকজনদের তিনি রাজার অজ্ঞাতে হুকুম দিলেন, খুঁজে দেখ ত তোরা আশেপাশে কোন সাধুসন্তের মৃতদেহ অসৎকৃত অবস্থায় পড়ে আছে নাকি, এমন কিছু দেখলেই তোরা তা অবিলম্বে দাহ করে ফেলবি।

মন্ত্রীর হুকুমে ছুটল লোকজন চারিদিকে,—কোথাও কোন সাধু-সন্ন্যাসীর মৃতদেহ পড়ে আছে কি না খুজতে। খুজতে খুজতে একদিন তারা পেয়েও গেল—শঙ্করাচার্যের পরিত্যক্ত দেহ এক নিভৃত কক্ষে। চারিধারে আচার্যের শিষ্যেরা বসে সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত। রাজবাড়ির লোকেরা শিষ্যদের উপর জুলুম করতে লাগল,—সরে যাও, ছেড়ে দাও তোমরা এ সন্ন্যাসীর মৃতদেহ, আমরা এ শব নিয়ে দাহ করব।

শিষ্যেরা বলে,—মৃতদেহ এ নয়, আমাদের গুরু সমাধিস্থ হয়ে আছেন, তাই তার দেহ এমন নিস্পন্দ; অপেক্ষা কর তোমরা,—সমাধি ভঙ্গ হ'ক গুরুজীর, তখন দেখবে তিনি তোমাদের মত জীবিত।

এমনি করে দুই দলে কথা কাটাকাটি হতে লাগল আর সেই ফাঁকে একদল শিষ্য রাজার কাছে গিয়ে তাকে একান্তে বললে, এদিককার বিপদের কথা। বেশী দেরী করলে রাজবাড়ীর লোকেরা

আচার্যের দেহটা নিয়ে দাহ করে ফেলবে।

না বেশী দেরী হ'ল না, মন্ত্রীপ্রেরিত লোকেরা আচার্য্যের শিষ্যদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা করতে করতেই দেখলে যে সন্ন্যাসীকে তারা মৃত মনে করেছিল তিনি চোখ মেলে চাইছেন, বক্ষে তার স্পন্দন সুরু হয়েছে। ঠিক এই সময় রাজপ্রাসাদে দেখা গেল রাজা অমরুক দ্বিতীয়বার মারা গেলেন।

বলা বাহুল্য এরপর কামশাস্ত্রের বিচারে আচার্য শঙ্করের কাছে মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয় ভারতী দেবী পরাজিতা হলেন। শঙ্কর নির্বিঘ্নে ভারতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হ'লেন।

## স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর যোগৈশ্বর্য দেখাবার পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তা না থাকলেও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে অযাচিত ভাবেই অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে। তার দুই-একটির বিবরণ শুধু এখানে দেওয়া হচ্ছে।

ছেলেবেলায় সঙ্গীদের নিয়ে মুনিদের মত ধ্যান-জপের খেলা খেলছেন নরেন। চোখ বুজে অনড় হয়ে প্রবীণ বয়স্ক ঋষির মত ধ্যানে বসেছেন তিনি,—দেহ নিস্পন্দ। হঠাৎ কোত্থেকে একটা ভয়ংকর গোখরো সাপ ফণা নাচিয়ে তাঁর সামনে এসে হাজির হ'ল। বন্ধুরা ত' সাপটা দেখে তখনই তাঁর সামনে থেকে পালাল। নরেনের কিন্তু হুঁশই নেই। দুই চোখ বুজে প্রস্তর মূর্ত্তির মত তিনি উপবিষ্ট। খেলার অভিনয় করতে গিয়ে কেবল অজানা মুহূর্তে ধ্যানের অতল গভীরে তলিয়ে গিয়েছে তার সত্তা। বাড়ির লোক সব মহা সন্ত্রস্ত, সাপকে তাড়া করতে গেলে অনর্থ ঘটতে পারে ভেবে সবাই চুপ

করে দাঁড়িয়ে। বালকের নড়ন-চড়ন নেই দেখে সাপটি কিছুক্ষণ পরে তার সামনে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল।

o o o

ঘুমাবার সময় উপুড় হয়ে শোয়ার অভ্যাস বালক নরেনের। ঘুম আসবার আগে বহির্জগতের চেতনা যখন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে থাকে তখন হয় তাঁর এক অলৌকিক অনুভূতি। তিনি দেখেন আলোকোদ্ভাসিত বর্ত বেয়ে একটি দিব্য বালক জ্যোতির্ম্ময় এক গোল পিণ্ড ঠেলে তাঁর দিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। জ্যোর্তিগোলক ধীরে ধীরে তাঁর জ্রর মধ্যে এসে স্থির হয়ে যায়। এই আলোর মাঝে নিমজ্জিত হয়ে শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এ কিছু আশ্চর্য বা অলৌকিক মনে হয় না নরেনের, তিনি ভাবেন—ঘুমের আগে সবারই এমনটি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পরে বালক-বয়সে নরেনের এই অনুভূতির কথা শুনে বলেছিলেন—'এটা যে ধ্যান-সিদ্ধের লক্ষণ গো।'

o o o

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কিছুদিন পরের কথা। নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর একা তাঁর তক্তপোশের উপর বসে আছেন। নরেনকে দেখেই পরম আনন্দে ও পরম স্নেহে তার শয্যার একপাশে বসলেন, তারপরই তিনি একেবারে ভাবাবিষ্ট। কিছুক্ষণ পরে আপন মনে বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে ঠাকুর তার ডান পা'টা নরেনের গায়ে ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘটল এক দিব্য অলৌকিক ভাবান্তর। তিনি দেখলেন—ঘরের দেয়ালগুলির সঙ্গে তার যাবতীয় কিছু ঘুরতে ঘুরতে কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের সঙ্গে নিজের নিজত্ব একাকার হয়ে সর্বগ্রাসী এক মহাশূন্যের দিকে ছুটে চলেছে। দারুণ ভয় পেয়ে গেলেন নরেন, তার মনে হতে লাগল নিজের নিজত্ব ত মৃত্যু, সেই মৃত্যুর মুখেই বুঝি ছুটে চলেছেন তিনি। নরেন মহা আতঙ্কে চীৎকার করে বলে উঠলেন, এ কি করে দিলে তুমি আমায়—আমার যে বাপ-মা আছেন।

অদ্ভুত পাগল ঠাকুর তার এই কথা শুনে খলখল করে হেসে

উঠলেন, তারপর হাত দিয়ে নরেনের বক্ষদেশ স্পর্শ করে বললেন, তবে এখন থাক, একবারে কাজ নেই, পরে হবে।

o o o

ঠাকুরের জীবনাবসানের কিছুকাল পূর্বের কথা। নরেন নির্বিকল্প সমাধির জন্য বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, এর জন্য তিনি বারবার ঠাকুরকে উত্যক্ত করে তোলেন। ঠাকুর তার এই ব্যগ্রতা বুঝে একদিন প্রশান্তকণ্ঠে তাকে বললেন, আচ্ছা। ঠিক করে বল ত—তুই কি চাস ?

নরেন সুযোগ পেয়ে পরমোৎসাহে বলে উঠলেন, আমার ইচ্ছা হয়—শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ-ছয়দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকি, তারপর কেবল শরীর বাঁচাবার জন্য একটু নীচে নেমে এসে আবার সমাধিমগ্ন হই।

রামকৃষ্ণদেবের নরেনের মুখের এ কথাটা পছন্দ হ'ল না। তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে তাকে তিরস্কার করে বললেন, তোর মুখে এমন কথা শুনব এ আমি কোনদিন ভাবতে পারি নি। ছি! ছি! তুই এত বড় আধার, তুই চাস এই! আমি ভেবেছিলাম তুই হবি একটা বিরাট বটগাছ,—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক এসে আশ্রয় নেবে, আর তুই কিনা স্বার্থপরের মত চাইছিস নিজের মুক্তি ?

তিরস্কার ত করলেন কিন্তু এর কয়েকদিন পর নরেনের এই মনোবাসনাও ঠাকুর পূর্ণ করলেন কাশীপুরের এক নিভৃতকক্ষে। এক রাত্রে নরেন ওখানে ধ্যানে বসেছেন আর একটি ভক্ত সাধকের সঙ্গে। নরেন তাকে গোপালদা বলে ডাকেন। গভীর ধ্যানে মগ্ন নরেনের মুখ দিয়ে হঠাৎ নির্গত হতে থাকে, ও গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল ? এ কি হ'ল আমার ?

গোপালদা শুনে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে বারবার নরেনের গায়ে করাঘাত করতে থাকেন। না, নরেনের চেতনার কোন লক্ষণই নেই। ক্রমে অন্যান্য গুরু ভক্তেরাও সেখানে এসে হাজির হ'লেন,—তারাও তার কোন চেতনার লক্ষণ দেখতে পেলেন না। সংবাদটা পরমহংসদেবের কানে গেলে তিনি শুধু বলে উঠলেন, বেশ হয়েছে থাকুক কিছুক্ষণ ঐ

রকম হয়ে। ওরই জন্যে যে ও আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।

গভীর রাত্রে বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসার পর নরেন যখন ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়ালেন তখন ঠাকুর বললেন, কেমন—মা আজ ত তোকে সব বুঝিয়ে দিলেন ? চাবি কিন্তু রইল আমার হাতে। এখন তোকে অনেক কাজ করতে হবে, আমার এই সব কাজ হয়ে গেলে তখন আবার চাবি খুলবো।

এই দিনকার অনুভূতির সম্বন্ধে পরে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সেদিন দেহাদির বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয়েছিল, প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি ! একটু অহং ছিল তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলাম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায় ঃ যেন মহাসমুদ্রে জল, জল ছাড়া আর কিছু নেই। ভাব আর ভাষা সব ঘুচিয়ে দেয়।

০ ০ ০

ঠাকুর চলে গেছেন। তাকে হারিয়ে তাঁর স্নেহধন্য কৃপাধন্য শিষ্যদের হৃদয় মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে। জীবনের পরমাশ্রয়হারা শিষ্যদের, আশা, আনন্দ, উৎসাহ কোন কিছুর লেশমাত্র আর অবশিষ্ট নেই।

শোক ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নরেন তাঁর এক গুরু ভাইয়ের সঙ্গে কাশীপুরের বাগানে ঘুরছেন। ভাবছেন—ঠাকুর তাঁদের এমন নিরাশ্রয় নিরালম্ব করে চলে গেলেন। এমন সময় হঠাৎ নরেনের নজরে পরল—দূরে তাদের পরমারাধ্য গুরুদেব দিব্য দেহে দাঁড়িয়ে। দেখে অভূতপূর্ব আনন্দে নরেনের সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, চোখে এসে গেল জল ঃ মহাপ্রয়াণের পরও তা হ'লে তিনি তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখছেন। নরেনের যুক্তিবাদী মন, পরক্ষণেই তাঁর মনে হ'ল এ দৃষ্টিভ্রম নয় ত,—শোককুল দুর্বল মনের কারসাজি নয় ত ?

কিন্তু তখনই তাঁর এ সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল তার সঙ্গী গুরুভাইয়ের চীৎকার শুনে ঃ নরেন, ঐ ছাখো ঐ ছাখো।

গাজীপুরে যাবেন স্বামীজী। তার অপর পারে এক ষ্টেশনে তখন

বসে। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, দেহ যেন আর চলতে চাইছে না। কাছেই একটা গাছের ছায়ায় বসে এক শেঠজী পরম উৎসাহে পুরী-কচুরী-হালুয়া খাচ্ছেন। খাওয়া হয়ে গেলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে তিনি স্বামীজীর দিকে চেয়ে বিদ্রূপ সুরু করলেন। তার মর্মার্থ সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী কেমন নিঃস্ব, অসহায় আর সংসারী লোকেরা খেটেখুটে আয় করে ভাল খেয়ে দেয়ে কেমন সুখে স্বাচ্ছ্যন্দে দিন কাটায়।

ঠিক এই সময় হঠাৎ এক অবাক্ কাণ্ডঃ কোত্থেকে একটা লোক ত্রস্তপদে একটা পুঁটলী ও এক কুঁজো জল নিয়ে স্বামীজীর সামনে এসে হাজির। পুঁটলীতে নানা উপাদেয় মিষ্টদ্রব্য বাঁধা। লোকটি পরম শ্রদ্ধা ভরে স্বামীজীকে ঐ আহার্য নিবেদন করে তামাক সাজতে বসে গেল।

কথায় কথায় জানা গেল লোকটা জাতিতে হালুইকর,—কাছেই তার একটা খাবারের দোকান। শেষ রাত্রে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। এক সন্ন্যাসী বাবা এসে তাকে বলছেন, স্টেশনের ধারে এক সাধু অনাহারে রয়েছেন, তুমি গিয়ে তার কিছু সেবার ব্যবস্থা করো। প্রথমে স্বপ্নের তেমন গুরুত্ব দেয় নি হালুইকর, ভেবেছে স্বপ্নে ত লোক কত কিছুই দেখে। কিন্তু এ স্বপ্ন সে যখন পরপর আরও তুইবার দেখল, তখন সে আর স্থির থাকতে পারেনি, ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

হালুইকরের মুখে এই কথা শুনে স্বামীজীর তুই চোখে জল এসে গেল : পরম আশ্রয়দাতা ঠাকুরের কৃপার ধারা পরপার থেকেও তাঁর দিকে এমনি করে বয়ে আসছে!

... .... .... ....

গাজীপুরে পওহারীবাবার কাছে এসেছেন স্বামীজী। বাবা সিদ্ধপুরুষ যোগী। তাঁর সাধন গুহায় রয়েছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একখানা ছবি। এ দেখে তাঁর দিকে স্বামীজীর মন আরও আকৃষ্ট হ'ল। স্বামীজী তখন অজীর্ণ এবং কোমর বাতে ভুগছিলেন, ভাবলেন এঁর কাছ থেকে কিছু হঠযোগ আর রাজযোগ শিক্ষা করলে মন্দ কি?

এ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাও নেবেন ঠিক করলেন স্বামীজী। প্রস্তাব দিলে—পওহারীবাবা তাতে রাজীও হয়ে গেলেন। দীক্ষা গ্রহণের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল।

দীক্ষার আগের দিন রাতে ঘটল এক বিস্ময়কর ব্যাপার : স্বামীজী শুয়ে আছেন, এমন সময় দেখলেন তাঁর শয়নকক্ষ দিব্য জ্যোতির শুভ্র-আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আর সেই জ্যোতিমণ্ডলের মাঝে রয়েছেন তাঁর স্বর্গত গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন ঠাকুর, আর সেই দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ছে অপরিমেয় স্নেহ-মমতা আর সেই সঙ্গে কিছু বেদনাও বুঝি।

প্রাণপ্রিয় গুরুর এই অলৌকিক আবির্ভাব স্বামীজীর অন্তর্সত্তায় এক প্রচণ্ড আঘাত হানল সেই ক্ষণে, অন্তরে জ্বলে উঠল আত্মগ্লানির জ্বালা : ছিঃ ছিঃ—এ কি করতে যাচ্ছি আমি? ঠাকুরের প্রতি যে অচলা ভক্তি একান্ত নিষ্ঠা আমি এত দিন হৃদয়ে পোষণ করে এসেছি, তা কি আমার লোপ পেল না কি? আমি কি তাঁর অবিশ্বস্ত চেলা? উত্তেজনায় তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল, গায়ে ঘাম দেখা দিল, অনুতাপে-উচ্চকণ্ঠে তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, না, না, এ কখনোই হ'তে পারে না, শ্রীরামকৃষ্ণ বিনা আর কোন গুরুর এ হৃদয়ে স্থান নেই।

... ... .... ...

আমেরিকায় চিকাগোকে বিশ্বধর্ম সম্মেলন হ'তে যাচ্ছে। এই সময় মাদ্রাজে বেশ বড় একদল ভক্ত জুটেছে স্বামী বিবেকানন্দের। তাঁরা চা'ন ভারতের সনাতন ধর্মের বাণী প্রচারিত হ'ক সেখানে। আর সম্মেলনে এ পৌঁছে দেবার সুযোগ্য পাত্র হচ্ছেন স্বামীজী। তাঁরা ধরে বসলেন স্বামীজীকে। রাজী হ'লেন তিনি। কারণ এ ব্যাপারে তাঁর নিজের আগ্রহও বড় কম নয়।

স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলের উদ্যোগে জনসাধারণের কাছ থেকে বেশ কিছুটা চাঁদাও উঠল। সম্মেলনে গিয়ে হিন্দুদের সনাতন ধর্মের বাণী জগৎবাসীকে শোনাতে পারবেন বলে স্বামীজীর উৎসাহের সীমা নেই, কিন্তু হঠাৎ এই সময় প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে,—

সম্মেলনে যেতে এত উৎসাহ জাগছে কেন তার,—এ কি শুধু দেশের কাজ, ধর্মের কাজ বলে, না নিজের অহং-বোধ, খ্যাতির লোভ তাঁকে এদিকে ঠেলে দিচ্ছে? এ সম্বন্ধে ভগবানের কোন স্পষ্ট নির্দেশ ত পান নি ;—তবে?

আত্মসমীক্ষামূলক এই রকম সব চিন্তা মনে উদিত হওয়ায় বিদেশে ধর্মপ্রচারের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই তিনি সমীচীন মনে করলেন, এবং তাঁর এ সিদ্ধান্ত ভক্ত শিষ্য বন্ধুবান্ধবদের তিনি জানিয়েও দিলেন। সংগৃহীত অর্থ গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হ'ল।

মাদ্রাজের ভক্ত শিষ্যেরা কিন্তু এতে দমবার পাত্র ন'ন, তাঁরা আবার নতুন করে স্বামীজীকে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে চাঁদা তুলতে লাগলেন। তাদের এই ঐকান্তিক উৎসাহ স্বামীজীকে আবার নতুন করে ভাবিয়ে তুললো : তাইত এখন কি করা যায়? ঠাকুর ত আর আর সশরীরে বিদ্যমান নেই,—সুতরাং তাঁর নির্দেশও কিছু পাবার উপায় নেই। তখনই আবার মনে হ'ল,—ঠাকুর না থাকলেও শ্রীমা ত আছেন,—তিনি ত তাঁরই অংশ! তার অনুমতি চাইলেই ত এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ঠিক করলেন তাঁর নির্দেশ চেয়ে একখানা পত্র লিখবেন। সেইদিনই এক অলৌকিক কাণ্ড সকল সমস্যার সমাধান করে দিল।

স্বামীজী শুয়ে আছেন, ঘুম আসছে না। চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'ল এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখলেন ঠাকুরের জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তি ভারত সমুদ্রের তীর থেকে বিদেশে যাত্রা করেছে। ঠাকুর সোজা সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন অপর পারের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে ডাকছেন তিনি স্বামীজীকে—তাঁকে অনুসরণ করতে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চিত দেহে উঠে বসলেন স্বামীজী—তার শয্যায় : তা হ'লে ঠাকুরও কি এ-ই চা'ন, এ-ই তাঁর অভিপ্রেত? ঠাকুরের মুখের অস্ফুট ধ্বনি তখনও যেন স্বামীজীর কানে বাজছে,—আয়, আয়।

এরপর দেবী সারদামণিকেও একখানা চিঠি লিখলেন স্বামীজী,—তাঁর মতামত চেয়ে অবশ্য নয়, কারণ অলৌকিক ভাবে ঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে স্বামীজী তাঁর যথা কর্তব্য তখন ঠিক করেই ফেলেছেন,—চিঠি

লিখলেন তিনি মায়ের আশীর্বাদ চেয়ে। লিখলেন, মাগো, মহাবীর যেমন রাম নাম নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে লাফ দিয়েছিলেন, আমিও তেমনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে যাচ্ছি। আশীর্বাদ করো তুমি।

দেবী সারদামণির আশীর্বাদ পেতে স্বামীজীর বিলম্ব হ'ল না, কারণ শ্রীমাও যে এর মাঝে ধ্যানাবেশে দেখেছের ঠাকুর সমুদ্রের তরঙ্গের উপর দিয়ে চলেছের আর নরেন চলেছেন তাঁর পিছুপিছু। চিঠিতে শ্রীমা তার এই অলৌকিক দর্শনের কথা জানিয়ে—জানালেন তার অন্তরের প্রাণঢালা আশীর্বাদ।

# রামদাস স্বামী

রামদাস স্বামী ছত্রপতি শিবাজীর গুরু। সাধুসন্তদের সমাজে রামদাস নামেই তিনি খ্যাত।

একদিন গভীর রাত্রের কথা। শিষ্য সেবকদের অনেকেই তখন ঘুমিয়ে, কিন্তু স্বামীজী তখন জেগে। পান সুপারী খাওয়ার অভ্যাস ছিল। স্বামীজীর, শিষ্যদের ডেকে বললেন, একবার ছাখো তো তোমাদের কৌটোয় পান সুপারি আছে কি না,—একটু না চিবুলে তো ভাল লাগছে না।

গুরুজীর কথায় শিষ্যেরা কৌটো খুলে দেখলে সুপারী তাতে যথেষ্টই আছে, কিন্তু পান একটিও নেই। শুনে স্বামীজী বলে উঠলেন, আরে রাম, পান ছাড়া কি সুপারী খাওয়া চলে?

পাহাড়ে জায়গা এত রাত্রে পান কোথায় মিলবে, পেতে হ'লে নীচে নেমে গ্রামের ভিতর যেতে হয়ঃ যদি কোন গেরস্থ বাড়িতে পানের সন্ধান পাওয়া যায়। শিষ্যেরা কি করবেন ভেবে না পেয়ে এ এ ওর মুখের দিকে চাইছেন। শিষ্য কল্যাণ কিন্তু কোন রকম দোমনা ভাব না দেখিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, প্রভু, একটু সবুর করুণ, আমি নীচে যাচ্ছি, গিয়ে কোন গেরস্থ বাড়ি থেকে কয়েকটি পান এখনই সংগ্রহ করে আনছি।

এই বলেই অন্ধকারে পাহাড়ী পথ বেয়ে কল্যাণ দ্রুত নীচে নামতে সুরু করলেন। বেশিক্ষণ নয় কয়েক মিনিট পরেই নীচে থেকে কল্যাণের আর্ত চীৎকার সবার কানে এলঃ রাত্রে দেখতে না পেয়ে কল্যাণ একটি কেউটে সাপের গায়ে পা দিতেই সে তাকে ছোবল মেরেছে। রামদাস—আর তাঁর শিষ্য সেবকেরা মশাল নিয়ে অমনি ছুটে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন সাপে কাটা কল্যাণ অসহ্য যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, মুখ দিয়ে অবিরাম ফেনা বেরুচ্ছে।

রামদাস তখনই তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বিড় বিড় করে কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, একটু পরে পরম স্নেহে বলে উঠলেন, বাবা কল্যাণ, এবার ওঠো, উঠে পড়।

গুরুর কথায় কল্যাণ চোখ মেলে একবার তাঁর দিকে চেয়ে উঠে বসলেন, তারপরই গুরুর জন্য পান সংগ্রহে নীচে যেতে উদ্যত হ'লেন।

রামদাস স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শিষ্যের দিকে চেয়ে বললেন, আর তোমায় যেতে হ'বে না, বাবা তুমি এবার আশ্রমে ফিরে চল।

আশ্রমে ফেরার পথে এক অল্পবয়সী শিষ্য মৃদুস্বরে মন্তব্য করলেন, এত রাত্রে মশাল না নিয়ে একলা কল্যাণের এভাবে চলে আসাটা ঠিক হয়নি।

স্বামীজী সহাস্যে বললেন, যা ঘটেছে রামজীর কৃপাতেই ঘটেছে, আমরা ত নিমিত্ত মাত্র। রামজী আমায় আভাসে জানিয়ে দিয়েছিলেন কল্যাণের আর আয়ু নেই।

গুরুজীর মুখে এ কথা শুনে একজন সেবক অমনি বলে উঠলেন, সে কি প্রভু, এ জেনেও আপনি তাকে এই অন্ধকার রাত্রে এই বনপথে যেতে দিলেন।

গুরু বললেন, সর্পাঘাতে ওর আজ জীবনান্ত হবার কথা, অথচ ভগবানের কাছে ওর এখন অনেক কিছু করবার আছে। আমি তাই ইচ্ছা করেই অন্ধকারে ওকে পান আনতে পাঠালাম। ওকে কালসাপে কাটবে তা আমি জানতাম, আমার কাছাকাছি থাকায় এই সুবিধা হ'ল যে রামজীর কৃপায় আমি ওকে বাঁচাতে পারলাম।

... ... ... ...

কাশী থেকে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছেন সেবার মহারাষ্ট্রে, তর্কশূর তিনি, বিচার মল্ল। দারুণ তাঁর অহংকার যেখানেই যান সেখানেই তিনি সাধু সন্ত আর পণ্ডিতের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। গলায় উপবীতের সঙ্গে ঝুলানো থাকে তার এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। দম্ভ ভরে সেটা সবাইকে দেখিয়ে বলেন, শাস্ত্র বিচারে যদি কখনো কেউ আমায় পরাস্ত করতে পারে আমি তখনিই নিজের হাতে এই ছুরি দিয়ে আমার জিভটা কেটে ফেলব।

মহারাষ্ট্রের ঘরে ঘরে তখন রামদাস স্বামীর 'দাসবোধ' পড়া হয়, তার বিদ্যাবত্তা এবং সাধনৈশ্বর্যের কথা লোকের মুখে মুখে। পণ্ডিতের তা কানে যেতে তিনি সদলবলে একদিন রামদাস স্বামীর আশ্রমের কাছে এসে খবর পাঠালেন তার সঙ্গে তর্ক দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হ'তে চান তিনি।

রামদাস সে খবর শুনে তার শিষ্যদের বললেন, বারাণসীর একজন মহাত্মার পদধূলি পড়বে আজ আমার এখানে, যাও, যাও তোমরা মশাল জ্বেলে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে এস তাকে আমার আশ্রমে। দেখো যেন কোন রকমে তার অমর্যাদা না হয়।

গুরুর কথায় সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করে বারাণসীর তর্কশূরকে আনলেন স্বামীজীর শিষ্যেরা। রামদাস নিজে এগিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে অভিবাদন জানালেন। পণ্ডিতের সে দিকে লক্ষ্যই নেই,—তিনি এসেই সদম্ভে বলে উঠলেন, আমার সময় বড় কম, কাল বিলম্ব না করে আমি যে সব প্রশ্ন করতে যাচ্ছি চটপট তার উত্তর দিয়ে যান—অবশ্য যদি পারেন।

শুনে হাসলেন রামদাস, বললেন, বিদ্যা মানেই হচ্ছে সেই পরম বস্তু যা অন্তরকে অলোকিত করে তবুও আপনি এমন ঘোর অন্ধকারে পড়ে রয়েছেন—আশ্চর্য!

শুনে ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দিগ্বিজয়ীঃ বটে, এতো স্পর্ধা তোমার। এখানে কার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কথা বলছ—জানো।

রামদাস স্মিতমুখে অতি বিনীত ভাবেই বললেন, তা জানি পণ্ডিতবর, এখন অনুগ্রহ করে আপনার শাস্ত্রতত্ত্বের যে কোন প্রশ্ন আপনি উত্থাপন করুণ, আশা করি সে সবের যথাযথ উত্তর আপনি এখনি পাবেন।

ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পণ্ডিত এবার রামদাসকে পরাভূত পর্যুদস্ত করতে সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলেন। এই সময় দেখা গেল রামদাস স্বামীর এক অসাধারণ অবিশ্বাস্য যোগবিভূতির লীলা। তর্কে কার জয় কার পরাজয় হয় দেখতে দুজনের সামনে তখন বহুলোক

ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এই ভিড়ের ভেতর থেকে একটি নিম্ন শ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত লোককে রাম দাস কাছে ডেকে কিছুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে করলেন শক্তি সঞ্চালন। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে তাকে বললেন, বৎস, পণ্ডিতবর যে সব শাস্ত্রীয় প্রশ্ন তোলেন তুমি যথাযথ সে সবের উত্তর দিয়ে দাও।

এরপর বহুজনসমক্ষে ঘটতে থাকে এক অভাবনীয় অবিশ্বাস্য কাণ্ড: অতি সাধারণ অর্ধশিক্ষিত লোকের মুখ থেকে অবিরাম নিঃসৃত হতে থাকে শাস্ত্রের এক জটিল দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। কাশীর দিগ্বীজয়ী ত ব্যাপার দেখে একেবারে স্তম্ভিত। এরপর বুঝতে তাঁর বাকী রইল না যে স্বামী রামদাস এক সিদ্ধ মহাপুরুষ। এ হেন অলৌকিক শক্তির অধিকারীর সামনে বিদ্যার দম্ভ প্রকাশ করে তিনি মহা ভুল করেছেন, করেছেন মহা অপরাধ।

এবার রামদাসের চরণ ধরে তিনি বারবার ক্ষমা চেয়ে নিজের জিহ্বা কর্তনের জন্য উদ্যত হ'লেন।

রামদাস পণ্ডিতের উপবীতে ঝুলানো ছুরিকাটি দূরে নিক্ষেপ করে তাঁকে বললেন, ক্ষমা আপনাকে আমি চাওয়ার আগেই করেছি, পণ্ডিতবর। শুধু এই কথাটি আপনাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আপনার রসনা, আপনার দেহ, সব কিছুই রামজীর। জিহ্বা কর্তন করতে হয় ত তিনিই করবেন। আপনার দর্প এবার রামজী ভূমিস্যাৎ করে আপনার ভালই করলেন, এবার সত্যিকার বিদ্যার অধিকারী হ'লেন আপনি।

বলা বাহুল্য দিগ্বিজয়ী এবার অতি দীনভাবে রামদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

০ ০ ০

কয়েকজন শিষ্য নিয়ে রামদাস স্বামী তখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিব্রাজন করছেন। ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটি গ্রামের ধারে বিশ্রাম করছেন। যেখানে তাঁরা বসেছেন, তার পাশেই একটা শ্মশান। হঠাৎ এক সদ্য বিধবার করুণ বিলাপ স্বামীজীর কানে এল।

মর্মভেদী ক্রন্দনে স্থির থাকতে না পেরে শিষ্যদের নিয়ে শ্মশানে এসে হাজির হ'লেন স্বামীজী। এসে দেখেন শ্মশান সেদিন লোকে লোকারাণ্য। কি ?—না গ্রামের পাটেল মারা গিয়েছেন আর তার স্ত্রী সতীরূপে স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে এসেছেন। সমগ্র ললাট তাঁর সিন্দুর লিপ্ত, পরিধানে তাঁর লালপেড়ে একটা নতুন শাড়ী।

শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের শেষে স্বামীর চিতায় আরোহন করতে গিয়ে সদ্য বিধবা স্বামীর মৃতদেহটি জড়িয়ে ধরে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন।

এই করুণ দৃশ্য দেখে বিধবার ক্রন্দন শুনে মহাপুরুষ রামদাস একেবারে অভিভুত হয়ে পড়লেন। করুণা জাগল তাঁর হৃদয়ে। তিনি মহিলাটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, মায়ী, শান্ত হও তুমি, আর কেঁদ না, রামজীর কৃপায় স্বামী তোমার আবার তাঁর প্রাণ ফিরে পাবেন।

এই কথা বলার পর রামদাস মৃতদেহের পাশে বসে কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন, তারপর নিজের কমণ্ডলু থেকে কিছুটা জল মৃতের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এক মহা বিস্ময়কর রোমাঞ্চকর দৃশ্য : মৃত প্যাটেল ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন।

জনতা তখন আনন্দে অধীর হয়ে রামদাসকে ঘিরে ফেলেছে, স্বামীজীর শিষ্যদের কণ্ঠ থেকে ঘনঘন উদ্গত হতে লাগল—জয় জয় জয় কৃপাসিন্ধু রঘুবীর, জয় জয় স্বামী রামদাস।

পাটেলের স্ত্রীর বিপুল আবেগে স্বামীজীর পা দু'টি জড়িয়ে ধরে সজল চক্ষে মিনতি করে বলতে লাগলেন, প্রভু, দয়া যদি করলেনই, তা' হলে আরও দয়া ভিক্ষা চাইছি আমি : এ দাসীকে আপনি উদ্ধার করুন, আমার স্বামী এবং আমাকে দীক্ষা দিন। আপনার আশ্রয়ে থেকে রামজীর নাম জপ করে বাকী জীবনটা আমরা কাটিয়ে দিই।

রামদাস অতি প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, মা, আমি ত প্রস্তুতি ছাড়া

কাউকে দীক্ষা দিই না। তুমি আমার পা ছাড়ো,—শান্ত হ'য়ে উঠে বসো, আমাকে এক্ষুণি অন্যত্র যেতে হবে, কাজ আছে।

মহিলাটি বললেন, বাবা প্রস্তুতি কাকে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমি বুঝেছি আপনিই আমার উদ্ধারকর্তা। আপনি এখনি চলে যেতে চাইছেন—যান, বাধা দেব না আমি। কিন্তু আমিও বলে রাখছি—এখন থেকে আমি যে কটা দিন বাঁচি প্রভু রামজীর নাম আর ধ্যান করে কাটাবো। আর এ-ও বলে রাখছি—আমি যদি সত্যিকার সতী হই তা হ'লে আমায় উদ্ধার করতে আপনাকে আবার আসতেই হবে।

সতীসাধ্বী মহিলার বাক্য নিষ্ফল হয় নি। ভক্তিমতী মহিলার দৃঢ় সংকল্প আবার মহাপুরুষকে টেনে এনেছে। মাসখানেক পরে ফিরে এসে তিনি পাটেল এবং তাঁর সহধর্মিনীকে দীক্ষা দিয়ে কৃতার্থ করেছেন।

o o o

শিবাজীর জন্মদিন সেদিন। এসেছেন তিনি ছাতন মঠে গুরুজীর আশীর্বাদ নিতে, সঙ্গে এনেছেন কয়েকটি দামী আঙরাখা ও শাল—প্রণামী হিসেবে।

প্রণাম আশীর্বাদ কুশল প্রশ্নাদির আদানপ্রদান ইত্যাদি সব হয়ে গেছে, এবার অন্য কথাবার্ত্তা হচ্ছে, স্বামীজীর সেবক শিষ্যেরা সব আশেপাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ শিবাজীর নজরে পড়লো গুরুজীর গায়ের চাদর, কৌপীন, বর্হিবাস সব একেবারে চপচপে ভিজে—দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র তিনি নদীতে স্নান করে এলেন। এ দেখে আশ্রমের সেবক শিষ্যদেরও বিস্ময়ের অন্ত নেই ঃ স্বামীজী ত স্নান তর্পণ ইত্যাদি সূর্যোদয়ের অনেক আগেই করে এসেছেন—তারপর সিক্ত কাপড় ছেড়ে তাদেরই দেওয়া শুষ্ক আন্তবাস কৌপীন ইত্যাদি পরেছেন,—তবে? এরপর তাঁর শুকনো কাপড় জামা আবার ভিজল কি করে?—আশ্চর্য।

কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে শিবাজী গুরুকে প্রশ্ন করে বসলেন, প্রভু, ব্যাপার ত কিছুই বুঝছি না। আপনার পরিধেয় এমন ভিজল কি করে, সবে স্নান করে সিক্ত বসনে আপনি বসে নেই,— নদীর জলও এখানে আপনার গায়ে উছলে পড়ে নি—তবে ?

রামদাস একটু হেসে উত্তর দিলেন, নদীর জল এ নয়, মহারাজ— এ সমুদ্রের জল।—এই বলে আঙরাখা তার চাদরের জল নিংড়ে শিবাজীর অঞ্জলিতে ঢেলে দিলেন : মুখে দিয়ে দেখুন।

জল মুখে দিয়েই চমকে উঠলেন শিবাজী : তাই ত, নদীর মিঠে জল এ তো নয়, এ যে লোনা—বিস্বাদ,—খাঁটি সমুদ্রের জল। এ হ'ল কি করে ? জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন শিবাজী গুরুজীর মুখের দিকে।

রামদাস মৃদু হেসে বললেন, আজকের তারিখটা আর এই ক্ষণটা তুমি শুধু মনে রেখো। ঠিক পনের দিন পরে আবার এই আশ্রমে এসো। তখন—এ সাগরজলের রহস্য উদঘাটিত হবে। আজ আর কিছু আমি বলব না।

গুরুজীর কথামত পনের দিন পরে শিবাজী আবার ছাফলের আশ্রমে এসে হাজির। এসে দেখলো এক ধনী বণিক নিরালায় বসে গুরুজীর সঙ্গে কথা বলছেন। শিবাজীকে দেখে রামদাস সস্নেহে তাঁকে কাছে ডেকে মৃদু হেসে বললেন, মহারাজ, সেদিন যে সাগরজলের রহস্য জানতে চেয়েছিলে, আজ তুমি তা শুনবে, আমার মুখে নয়, ইনি আমার এক প্রিয় শিষ্য, নাম মুঙ্গেজী রাজাপুরের লোক, এর মুখেই শোন সব বৃত্তান্ত।

মুঙ্গে এতক্ষণ ধরে স্বামীজীর কাছে যে ঘটনার কথা বলছিলেন, তাই আবার শোনালেন শিবাজীকে। ঘটনাটা এই—

মারাঠার বিশেষ নামকরা বণিক মুঙ্গে পনের দিন আগে জাহাজ-ভর্তি মালপত্র নিয়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। হঠাৎ সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠায় তার দাপটে জাহাজটি তাঁর জলমগ্ন হতে থাকে। মুঙ্গে ভীষণ ভয় পেয়ে ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য তারস্বরে গুরুদেবকে ডাকতে থাকেন। একটু পরেই দেখেন জাহাজের উপর জ্যোতির্ময় মূর্তিতে

তাঁর গুরু রামদাস। গুরু বরাভয়ভঙ্গিতে আশ্বাস দিচ্ছেন শিষ্য মুঞ্জেকে। একটু পরেই ঝড়ের তাণ্ডব থেমে যায়, সমুদ্র আবার আগেকার মত শান্ত মূর্তি ধারণ করে। মুঞ্জের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর গুরু রামদাসের কৃপাবলেই মালপত্র সমেত জাহাজটি তাঁর ভরাডুবি থেকে বেঁচেছে, রক্ষা পেয়েছে মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে তাঁর নিজের প্রাণ। বিভিন্ন বন্দরে মাল সরবরাহ করে মাত্র আগের দিনই মুঞ্জে ঘরে ফিরেছেন। আজ এসেছেন গুরুর চরণদর্শনে।

শিবাজী মুঞ্জেকে প্রশ্ন করে জানলেন—পনের দিন আগে যে তারিখে যে ক্ষণে তিনি গুরু রামদাসের পরিধেয় সিক্ত দেখেছেন ঠিক সময়েই বণিকের বিপন্ন জাহাজের উপরে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে স্বামী রামদাসের আবির্ভাব ঘটে।

———

# বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী

হায়দ্রাবাদের একটি গ্রামের নাম কল্যাণী। সেই কল্যাণীতে জন্মাষ্টমীর পুন্য দিনে মাতুল সবসুখরামের গৃহে বিশুদ্ধানন্দের জন্ম। জন্ম দিবসটি যেমন পবিত্র চেহারাটিও তেমনি সুন্দর, তাই আদর করে নবজাতকের নাম রাখা হয় বংশীধর।

বছর খানেক পর পূজা হোম যাগযজ্ঞ করে বংশীধরের অন্নপ্রাশন হয়ে যায়। এর কিছুকাল পরেই বংশীধরের দেখা দেয় দুশ্চিকিৎস্য মূর্চ্ছা রোগ। শিশুর দেহ দিন দিন ক্ষীণ ও দুর্বল হতে থাকে। গৃহে নেমে আসে হতাশা আর বিষাদের অন্ধকার।

মাতুল সবসুখরাম কিন্তু বড়ই ভালবাসেন এই রুগ্ন সুদর্শন ভাগনেটিকে। একটু সুযোগ পেলেই তিনি বংশীধরকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন এবং নানা কথা নানা গল্প বলে তাকে উৎফুল্ল রাখতে চেষ্টা করেন।

বংশীধরের বয়স যখন চার বৎসর, একদিন মাতুল সবসুখরাম তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তখন পথি মধ্যে বংশীধরের চোখ দুটি হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল, সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল, মাতুলের হাতটি জোরে আঁকড়ে ধরে তাঁর মুখের দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইল।

কি-রে কি হ'ল তোর, আমাকে কিছু বলবি?

উত্তরে উত্তেজিত বংশীধর বলতে থাকে, মামাজী, মামাজী, আমার —কেতাব ?—কেতাব কোথায়?

কোন কেতাবের কথা বলছিস তুই,—ভাল করে বুঝিয়ে বল ত দেখি!

কেন আমার নিজের সেই কেতাব! সেটি এনে দাও আমায়, সেটি পেলেই আমার ব্যামো সেরে যাবে, ভালো হয়ে উঠবো আমি।

উদ্‌ভ্রান্তের মত বংশীধর বলতে থাকে এ কথা বারবার।

শুনে সবসুখরাম ভাবেন কঠিন অসুখ ভুগে ভুগে ভাগনের মাথার একটু গোলমাল হয়ে গেছে, হঠাৎ খেয়াল চেপেছে তার একটা বই চাই। তাকে শান্ত করতে বাড়িতে এসে মাতুল রঙ বেরঙের কয়েকখানা বই এনে তার হাতে দিলেন। বংশী সেগুলি দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলতে লাগল,—এ কেতাব না, আমার সেই কেতাব চাই, সেই কেতাব আমায় এনে দাও।

বেশ ত, তাই এনে দেব তোকে, কিন্তু সেটা কোথায় রেখেছিস তুই, তা ত বলবি।

ছলছল চোখে বংশী উত্তর দেয়, কেন,—সে কেতাব রয়েছে আমার কুটিয়ায়। তোমরা শীগগির খুঁজে সেটা আমায় এনে দাও, নইলে —আমি মরে যাব।

পাগলের মত এ কি বলে বংশী,—বাড়ীর লোকের তা কিছুই বোধগম্য হয় না, তারা ভাবেন মূর্চ্ছা হয়ে হয়ে মাথাটা ওর একেবারে বিগড়ে গেছে।

বংশীর এই অবস্থা দেখে তার জননী যমুনা দেবীর মনে এক ফোঁটা শান্তি নেই। সাধুসন্তের খোঁজ পেলেই পুত্রের নিরাময়ের জন্যে তাদের কাছে ছুটে যান, পণ্ডিত দেখলে তাঁকে ঘরে এনে তাঁকে দিয়ে শান্তি স্বস্তয়ন করান। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। যমুনা দেবী শেষে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েন।

পুত্রকে নিয়ে যখন যমুনা দেবীর এই রকম দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ তখন তাঁর হঠাৎ কানে গেল কল্যাণীর শ্মশানে এক সতীদাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এক ক্ষত্রিয়া নারী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে যাচ্ছেন। খবরটা কানে যেতেই যমুনাদেবী পুত্রকে নিয়ে ছুটলেন শ্মশানের দিকে। সাধারণের ধারণা স্বামীর চিতায় উপবিষ্টা সতী নারীর আশীর্বাদ একেবারে অমোঘ, অব্যর্থ।

চিতাশয্যার—কাছে গিয়ে যমুনা দেবী সতীকে কাঁদতে কাঁদতে নিজের পুত্রের কঠিন ব্যাধির কথা বলা মাত্র সতী বলে উঠলেন, বহিন কিচ্ছু ভেবো না তুমি তোমার ছেলের জন্যে। সিদ্ধ যোগীর চিহ্ন রয়েছে

তোমার ছেলের দেহে। অকাল মৃত্যু হবে না তোমার পুত্রের—কিছুতেই, কিন্তু একে ঘরে রাখা তোমাদের চলবে না, এ হবে নাম করা এক সন্ন্যাসী।

পুত্র বংশীকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন যমুনা দেবী। বেশ কিছুদিন মূর্চ্ছা রোগ আর তার দেখা দিল না। বৎসর খানেক পরে আবার এই রোগ দেখা দিল। আত্মীয় স্বজন আবার উদ্বেগে পড়লেন।

কীর্ণা আর মঙ্গিরা নদী এসে মিশেছে—কল্যাণীর একেবারে কাছেই। এই পবিত্র সঙ্গমে বিশিষ্ট দিনে প্রতি বৎসর একটা মেলা বসে, হাজার হাজার লোক সেই সময় পুন্যস্নান করতে আসে।

সবসুখরাম বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এখানে পুন্য-স্নান করতে এসেছেন, প্রিয় ভাগনেটিকেও সঙ্গে এনেছেন। স্নান তর্পণ হয়ে গেলে এক বন্ধু বললেন, কাছেই এই পর্ণকুটিরে এক উঁচুদরে সাধু বাস করেন, যাবে তাঁকে দেখতে ?

লোকটির মুখে এ কথা শুনে সবাই যাবার জন্য তৈরী। রকম দেখে সবসুখরাম বললেন, উঁহু, এত লোক গিয়ে মহাত্মার শান্তিভঙ্গ করা ঠিক হ'বে না, ছোট ছেলেমেয়েরা সব এই ঘাটে বসে থাক, চল আমরা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসি।

আর সবাই সবসুখরামের কথায় সায় দিলেও গোল বাঁধিয়ে বসল তার পাঁচ বছরের ভাগ্নে বংশীধর। সে বলে উঠল, না, আমি থাকব না, আমি যাবই সাধুজীকে দেখতে, কিছুতেই আমি থাকব না। আমাকে নিয়ে চল, নিয়ে চল।—এইবলে সে তুমুল কান্না আর চীৎকাল সুরু করে দিল।

সবসুখরাম পেরে উঠলেন না তার ভাগনের সঙ্গে, নিয়ে যেতে হ'ল তাকে সাধু সদর্শনে।

সবাই এসে সাধুকে প্রণাম করলে সাধু একে একে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। সবসুখরাম ভাগনের দিকে তাকিয়ে এবার বললেন, এখানে আসবার জন্য ত বায়না ধরলি, কত কান্নাকাটি করলি, এসে কি লাভটা হ'ল তোর—বলতো ?

কিন্তু পাঁচ বছরের বংশী তখন যেন সে বালকটি আর নেই, তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে সে তখন সাধুর কুটিরের এদিক ওদিক চেয়ে কি যেন খুঁজছে। হঠাৎ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলে উঠল, মামাজী, এই তো সেই কুঠিয়া, এই কুঠিয়ার ভেতরেই আমার সেই কেতাব আছে। আমার নিজের কেতাব, নিজের হাতে লেখা।

সবসুখরাম কিছু বুঝতে না পেরে মহাত্মার দিকে চেয়ে বললেন, প্রভু, শুনলেন ত বালকের কথা! ওর নিজের হাতে লেখা কেতাব নাকি এখানে আছে। এই কেতাবের কথা ওর মুখে আমরা আগেও কতবার শুনেছি, কি ব্যাপার, ও কি বলতে চায় আমরা কিছুই বুঝি না।

সাধুজী প্রশান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কিছু বলে বালক?

সবসুখরাম বললেন, প্রভু, সব কথা খুলেই বলি: আমার এই ভাগ্নেটি বহুদিন যাবৎ মৃগীরোগে ভুগছে। ও মাঝে মাঝে প্রায়ই বলে, আমার নিজস্ব যে কেতাবটা আছে সেটা আমায় এনে দাও, সেটা এনে দিলেই আমার এ অসুখ সেরে যাবে। এখন ত আপনি নিজের কানেই শুনলেন—ও বলছে এই কুঠিয়ায় আমার সে কেতাব আছে।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন মহাত্মা তারপর স্থির কণ্ঠে বললেন, আমার মনে হচ্ছে সাধারণ বালক এ কথা বলছে না, বলছে কোন দিব্য ভাবের আবেশে। তোমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ আমার কুঠিয়ায় কোথায়ও কোন হাতে লেখা পুঁথি আছে কিনা।

ছোট্ট খড়ে ছাওয়া ঘর। গ্রন্থপেটিকা একটা আছে বটে, কিন্তু সাধুর আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। সব কিছু তন্ন তন্ন করে খোজা হ'ল কিন্তু বংশী যে বইয়ের কথা বলছে তা কোথাও পাওয়া গেল না।

বংশী তখন এক অদ্ভুত ভাবে আবিষ্ট। সারা দেহ তখন তার রোমাঞ্চিত, কম্পমান, দুই চোখে পুলকাশ্রু, নিঃশ্বাস অতি দ্রুত। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বলে উঠল, চালের বাতা ভাল করে খুঁজে দেখ তোমরা।

তার নির্দ্দেশমত স্থানটি খুঁজতে গিয়েই পাওয়া গেল সেখানে একখানা অতি পুরাতন হাতে লেখা জীর্ণ পুঁথি, একখানা শক্ত কাপড় দিয়ে জড়ানো।

পুঁথিখানা বংশীর হাতে তুলে দেওয়া মাত্র তার চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আবেগের ভাব কেটে গিয়ে শান্ত হল সে। যেন স্বাভাবিক সুস্থ একটি বালক।

এবার পুঁথিখানা পরীক্ষা করতে সাধুজীর হাতে দেওয়া হলেই তা দেখে বিস্ময়ে তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সজল চক্ষে আবেগ ভরা কম্পকণ্ঠে তিনি বললেন, এ যে আমার স্বর্গত গুরুদেবের নিজের হাতে লেখা পুঁথি! নিজে হাতে গীতার সারমর্ম লিখে রেখেছেন তিনি এতে। গ্রন্থখানি বড়ই প্রিয় ছিল তাঁর। দেহত্যাগের প্রাক্কালে বারবার তিনি এ গ্রন্থখানি চেয়েছিলেন। খুঁজে পাওয়া যায় নি তখন। মর্মাহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।

শুনে সবসুখরাম করজোড়ে প্রশ্ন করলেন, প্রভু, সেই গ্রন্থের সঙ্গে এই বালকের কি সম্পর্ক তা ত ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু খোলসা করে বলুন না।

সাধুজী উত্তরে বললেন, ভগবান গীতাতে বলে গেছেন দেহত্যাগের সময় লোক যে ভাব নিয়ে যায় পরের জীবনে সেই ভাব আর সংস্কারই দেখা যায় তার চরিত্রে। তোমাদের এই বালক জাতিস্মর, পূর্বজন্মে ইনিই আমাদের গুরুদেব ছিলেন। এই আশ্রমটা তাঁরই আশ্রম। এখন থেকে এর দেহ রোগমুক্ত হ'ল। তোমরা দেখো বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এঁর সাত্ত্বিক সংস্কার সব জেগে উঠবে, আর পূর্ব জন্মের সাধনার ফলে এ জন্মেও গ্রহণ করবেন ইনি সন্ন্যাস জীবন।

সাধুজীর কথা বিফল হয়নি, সবসুখরামের ভাগ্যে বংশীধরই পরে হন বিখ্যাত সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী।

# শিখ গুরু অমরদাস

নানক, নানকের পর অঙ্গদ, তারপর অমরদাস। অমরদাস হচ্ছেন তৃতীয় শিখগুরু। সাধনার উপজাত ফলশ্রুতি স্বরূপ পূর্ব্বাচার্যদের মত নানা যোগৈশ্বর্য লাভ করেছেন তিনি।

অমরদাসের গদী হয়েছে গোবিন্দোয়ালে। শিখদের একটা উপ-নিবেশ গড়ে উঠেছে সেখানে। প্রতিদিন ভক্ত শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের জন্য লঙ্গরখানায় রন্ধন এবং বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ দুই কাজের জন্যই প্রচুর কাঠের প্রয়োজন। এই কাঠ সংগ্রহের জন্য অমরদাস তাঁর এক অন্তরঙ্গ শিষ্য সওয়াল মলকে পাঠিয়েছেন কাংড়ার পার্ব্বত্য অঞ্চল হরিপুরে। সেখানে প্রচুর সেগুন আর দেওদার।

সওয়াল মল হরিপুরে পৌঁছলে দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থী আসতে লাগল তাঁর কাছে। আসবেই ত, গুরু কৃপায় বিপুল যোগবিভূতির অধিকারী তিনি, যাকে যা আশীর্বাদ করেন তাই ফলে যায়।

হরিপুরের রাজার এ কথা কানে যেতে তিনি নিজেও এলেন তাঁকে দর্শন করতে, এসে অমরদাসের এই শিষ্যের যোগ বিভূতি দেখে মুগ্ধ হলেন।

কথা প্রসঙ্গে সওয়াল মল যখন রাজাকে তাঁর হরিপুর আসার কারণটি জানালেন, রাজা তখন পরমোৎসাহে হরিপুর থেকে কাঠ পাঠাতে লাগলেন। সেই কাঠে বিপাশা তীরে শত শত গৃহ সমন্বিত এক শিখ উপনিবেশ গড়ে উঠল।

রাজা এরপর গুরু অমরদাসকে দর্শনের জন্য মহা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। অনুমতি সহজেই মিলল। হরিপুররাজ তখন তাঁর কয়েকজন রাণী এবং উচ্চ কর্মচারীদের নিয়ে গোবিন্দোয়ালে রওনা হলেন। হাতী ঘোড়া এবং তাঞ্জামের রাজকীয় মিছিলটি গোবিন্দোয়ালের কাছাকাছি এসে পৌঁছলে অমরদাস বলে পাঠালেন, রাজা আমাদের মহা উপকারী বন্ধু

তাঁকে স্বাগত জানানোই আমাদের কর্তব্য, কিন্তু একটি কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এখানকার নিয়ম হচ্ছে গুরু দর্শন করতে হ'লে তাঁকেও শিখদের লঙ্গরখানায় সবার সঙ্গে বসে পংক্তিভোজন করতে হবে।

রাজা সানন্দে এ নির্দেশ মেনে নিলেন। সুতরাং গুরু দর্শনের আর কোন বাধা রইল না। ভোজন শেষে রাজা গুরু দর্শন লাভ করলেন। দ্বিতলের এক কক্ষে রাত্রে গুরু অমরদাস রাজা এবং তাঁর রাণীদের সঙ্গে পরমানন্দে ধর্মালোচনা করছেন, নানা উপদেশ দিলেন, এমন সময় তাঁর হঠাৎ নজর পড়ল রাজার নব পরিণীতা রাণীর দিকে। এই রাণী গুরুর অনেকটা কাছাকাছি বসে বেশ নিবিষ্ট মনেই গুরুর কথা শুনছেন বটে, কিন্তু ওড়না দিয়ে তাঁর সারা মুখটি ঢাকা।

এই দেখা মাত্র গুরু অমরদাসের ভাষণ গেল থেমে, তাঁর সদা প্রফুল্ল মুখে নামল এক বিষাদের ছায়া। শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি রাণীকে বললেন, মায়ী, তোমার কি মাথার কোন গণ্ডগোল হয়েছে, ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছ কেন? গুরুকে দর্শনই যদি না করবে, তবে এত কষ্ট করে এখানে আসা কেন? ওড়না দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে রাখলে গুরু দর্শন হবে কি করে?

অমরদাসের এ কথাতেও কোন সাড়া নেই রাণীর। ক্ষণকাল পরেই ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার: রাণী ওড়না দিয়ে তাঁর মুখখানা আরও ভাল করে ঢেকে হাসির তুফান তুলে সেখান থেকে উঠে বিদ্যুৎ গতিতে কাছেরই একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে গেল কিন্তু অমরদাসের চোখে মুখে কোন চাঞ্চল্য বা ভাবান্তর নেই।

রাজা এবং তাঁর সভাসদেরা ভীত ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে নীচে ছুটে এলেন। রাণী যে হঠাৎ উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এ বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত, কিন্তু এ অবস্থায় কি করণীয় কেউই তা ভেবে পান না।

গুরু অমরদাস এবার উপর থেকে নীচে নেমে এলেন। রাজার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, রাণী নিজের কর্মফলে এ উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, বিশেষ উদ্বেগের কারণ নেই, কয়েক

দিনের মধ্যেই এ রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এখানে আসবেন। যে উদ্দেশ্যে তার এখানে আসা তাই যে তাঁর এখনও হয়নি ঃ গুরুদর্শন হয়নি। শান্ত হন আপনি, ভয়ের কোন কারণ নেই।

সকলেই চান—বনে এখনি রক্ষীদল পাঠানো হ'ক, উন্মাদিনী রাণীকে তারা ধরে আনুক।

অমরদাস প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, এখন রাণীর পিছু ধাওয়া করলে তিনি চিকিৎসার বাইরে চলে যাবেন। গোবিন্দোয়ালের আকাশে বাতাসে মাটিতে ছড়িয়ে আছে গুরু নানকের প্রাণ সঞ্জীবনী নাম। এই নামের পুণ্য স্পর্শ পেয়েই রাণী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবার এখানে ফিরে আসবেন। চিন্তার কোন কারণ নেই।

সওয়াল মল এবং আর আর ভক্তেরা রাজাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন, মহারাজ, আপনি অযথা ভাববেন না। রাণীর এ রোগের ভোগ এবং মৃত্যুযোগ গুরু অতি অল্প দুর্ভোগের ভেতর দিয়েই কাটিয়ে দিলেন। কয়েকটা দিন আপনি একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে থাকুন। গুরুর কৃপাশক্তির মহিমা আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, আপনিও কিছুটা দেখুন।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রাজা হরিপুর রওনা হলেন, গুরুর আদেশে সওয়ালমল তাঁর সঙ্গে গেলেন।

গুরু অমরদাসের সাহানসাহ নামে একটি ভক্ত ছিল, সে যেমনি মূর্খ, তেমনি সরল। সে শিখ লঙ্গরখানায় খেয়ে দিনরাত গুরুর আশে পাশে ঘুরে বেড়াত, তাঁর ফাইফরমাস খাটত। কি শীতকাল কি গ্রীষ্ম সব সময়েই তার গায়ে জড়ানো থাকে একটি কালো কম্বল। কেউ কোন কাজ করতে বললে অথবা কিছু মন্তব্য করলে সে অমনি বলে ওঠে সাচ্, সাচ্। তাই সবাই তার নাম রেখেছে—সাচন্‌সাচ্।

এই সাচন্‌সাচ্ তখন একদিন লঙ্গরখানার জন্য জ্বালানী সংগ্রহ করতে গভীর বনের ভেতর গিয়ে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ কোত্থেকে এক অর্ধনগ্না উন্মাদিনী নারী এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঁচড়ে কামড়ে অস্থির করে তোলে। শুধু এই নয় এরপর মহাবিক্রমে ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটির উপর ফেলে হিঁচড়ে টেনে নিতে থাকে।

সাচন্ সাচ্ কোন রকমে এই উন্মাদিনীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে ছুটে গোবিন্দোয়ালে এসে গুরুর সামনে বসে হাঁফাতে থাকে। আঁচড়ে কামড়ে এবং মাটিতে হিঁচড়ানোর ফলে বেচারার দেহ তখন ক্ষত বিক্ষত।

কৌতূহলী সবারই প্রশ্ন এ দুর্দশা তার কি করে হ'ল, কে করল ?

একটু সামলে নিয়ে সাচন্ সাচ যা বললে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম হচ্ছে এই ঃ সেদিনকার—সেই পাগলী রাণীকে সে আজ বনের মধ্যে দেখে এসেছে। কাপড়-চোপড়ের তাঁর একেবারে ঠিক নেই, চেহারা তাঁর ঠিক এক পিশাচের মত। তাঁর হাত থেকে কোন রকমে মুক্তি পেয়ে সে প্রাণে বেঁচেছে।

উপস্থিত ভক্তদের দিকে চেয়ে অমরদাস তখন অনুচ্চকণ্ঠে বলেন, কর্মভোগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রাণী এবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন।

এরপর তিনি তাঁর পায়ের একপাটি পাদুকা খুলে সাচন্সায়ের হাতে দিয়ে বলেন, তুমি এটা তোমার কম্বলের নীচে লুকিয়ে নিয়ে যাবে, রাণী কালও তোমাকে দেখামাত্র আক্রমণ করতে ছুটে আসবেন। তুমি তখন কৌশলে এই পাদুকাটি তাঁর গায়ে ছোঁয়া লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বের সুস্থ অবস্থা ফিরে পাবেন।

পরদিন সান্সাচ কাঠ কুড়ুতে বনে গেলে গুরু অমরদাস যেমনটি বলেছিলেন—ঠিক তেমনটিই ঘটল। সাচন্সাচকে বনে দেখতে পেয়েই রাণী ঠিক আগের দিনের মতই তাকে আক্রমণ করলেন, আর সাচন্সাচ গুরুর নির্দেশমত তাঁর একপাটি পাদুকা তাঁর গায়ে ছোঁয়া লাগিয়ে দিলে। এর একটু পরেই দেখা গেল রাণী ক্রমশঃ তাঁর স্বাভাবিক সুস্থ মানসিকতা ফিরে পাচ্ছেন। মাথার চুলগুলি তখন তাঁর এলোমেলো, জটপাকানো, ছিন্নভিন্ন শাড়িতে দেহ অর্ধ অনাবৃত। নিজের এই অবস্থার দিকে নজর পড়তেই রাণী লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে নিকটস্থ একটা ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করলেন।

সাচন্সাচ্ রাণীর মনের অবস্থা বুঝে নিজের কম্বলটা চিরে দুই খণ্ড করে তার এক খণ্ড রাণীর দিকে ছুঁড়ে দিলে।

গোবিন্দোয়ালে ফিরে এসে দেখা গেল রাণী সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক

অবস্থা ফিরে পেয়েছেন। এসেই গুরুর চরণে পতিত হয়ে তিনি তাঁর স্তুতিগান করতে লাগলেন, ভক্তির আবেগে ছুই চোখে তখন তাঁর অশ্রুর ঢল।

o o o

শিখধর্মগ্রন্থে বৈরাগী মৈদাসের গুরুকৃপালাভের এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। গুরু অমরদাসের খ্যাতি শুনে ভক্ত-বৈষ্ণব একদিন গোবিন্দোয়ালে এসে হাজির। এখানকার নিয়ম হচ্ছে গুরু-দর্শন করতে হ'লে লঙ্গরখানায় সবার সঙ্গে বসে পংক্তিভোজন আগে করতে হবে, নইলে গুরুদর্শনের অধিকার নেই।

মইদাস নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, আহার সম্বন্ধে তাঁর অনেক বাছবিচার। কে রেঁধেছে জানা নেই,তা ছাড়া সবার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খাওয়া তাঁর মনঃপূত হ'ল না। সুতরাং গুরুদর্শনের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে যাত্রা করলেন তিনি দ্বারকাতীর্থের দিকে।

চলতে চলতে এসে পড়লেন তিনি গুজরাটের এক ঘন বনের মধ্যে। রাত্রিকালে আশপাশে কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। এরপর সুরু হ'ল সেখানে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। অতি কষ্টে এক বৃক্ষকোটরে উঠে কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে তিনি কোনরকমে রাত কাটালেন।

বন এত ঘন যে দিনের আলো দেখা দিলেও কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। এই বনে কয়েকদিন চলে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন মইদাস; তার উপর অনাহারের জ্বালা। ক্রমে শরীর এমন অবসন্ন হয়ে পড়ল যে এখান থেকে বাইরে বেরুবার সামর্থ্য তাঁর রইল না। এ বিপদে কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর আর গতি নেই, কেউ সহায় নেই, তাই মনেপ্রাণে তিনি তাঁর ইষ্টদেবতাকেই স্মরণ করতে লাগলেন। একটু পরেই দেখেন তাঁর সামনে আসছেন জটাজুটধারী এক বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী, হাতে রয়েছে তাঁর এক খাবারের থালা, রয়েছে তাতে ভাত, ডাল আর তরকারী। বৈষ্ণব মইদাস বড়ই ক্ষুধার্ত, কিন্তু আহার্য গ্রহণে তাঁর বাধলো : কোন জাতির লোকের রান্না এ – তার ঠিক কি ?

সাধু তার হাবভাব দেখেই বুঝলেন—অন্নগ্রহণে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের মন সায় দিচ্ছে না। তখন তিনি থালাটি হাতে নিয়েই এক বৃক্ষের

আড়ালে চলে গেলেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি আবার ফিরে এলেন। হাতে এবার তার এক নতুন পাত্র,—তাতে রয়েছে গরম লুচি আর মিষ্টি। সাধু স্নিগ্ধ হাসিমুখে পাত্রটি মইদাসের সামনে রেখেই আবার সেখান থেকে অন্তর্হিত হ'লেন।

অজানা লোকের রাধা ভাত ডাল খেতে মইদাসের আপত্তি থাকলেও লুচি-মিষ্টি খেতে কোন বাধা ছিল না। ক্ষুধার্ত মইদাস তা উদরস্থ করে সুস্থ হবার পর মনে পড়ল তাঁর এই সাধুর কথা : কোত্থেকে এলেন তিনি, কোথাই বা গেলেন। আশেপাশে অনেক খুঁজেও তার দেখা পেলেন না।

এবার ভাবতে হ'ল তাঁর : তাই ত,—সাধুটি প্রথমে এসেছিলেন ভাতের থালা নিয়ে, এ বিজন দুর্গম অরণ্যে এ খাদ্য সংগ্রহ করা ত সহজ কথা নয়। মইদাসের এ খাওয়া চলবে না বুঝে পরক্ষণেই আনলেন লুচি আর মিষ্টির থালা। এত শীগগির তিনি এসব সংগ্রহই বা করলেন কি করে?

হঠাৎ ভাবনার এক বিদ্যুৎ-ঝলকে যেন সমস্যার সমাধান হ'য়ে গেল : তাই এই বিজন অরণ্যে তিনি ক্ষুধায় ক্লিষ্ট জেনে এ ভাবে কোন সাধু বা সন্ন্যাসী তার আহার্য যোগাতে এলেন—এ কখনো হ'তেই পারে না, তার প্রাণ বাঁচাতে তার ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণই ছদ্মবেশে এসে তাকে কৃপা করে গেলেন। মইদাস তখন কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা জানাতে থাকেন, হে কৃষ্ণ, হে প্রভু বাসুদেব, কৃপা করে যদি অধম দাসের প্রাণরক্ষাই করলে, তবে একবার দেখা দিয়ে তার জীবন ধন্য করো।

প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দেবকণ্ঠের এক প্রত্যাদেশ এল তার কানে, মইদাস তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরু হচ্ছেন অমরদাস, অযথা কালক্ষেপ না করে, মনে দ্বিধা সংশয় না রেখে অবিলম্বে তার আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি সাধন ভজন করতে থাকো। এতেই তুমি সিদ্ধকাম হবে।

প্রত্যাদেশ পাবার পর মইদাস আবার ফিরে এলেন গোবিন্দো-য়ালে। নৈষ্ঠিকতার যে সংস্কার আর অহংবোধ এতদিন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবল বাধা হয়ে ছিল, কি এক যাদু মন্ত্রে যেন তা কর্পূরের মত

উবে গেছে। গোবিন্দোয়ালে এসে লঙ্গরখানায় বিনা দ্বিধায় তিনি সবার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে আহার করলেন, তারপর লাভ হ'ল গুরুর দর্শন।

° ° ° °

গুরু অমরদাস তাঁর দ্বিতলের শয়নকক্ষে নিদ্রামগ্ন। শেষরাত্রে এক স্ত্রীলোকের বুকফাটা কান্নায় তার ঘুম ভেঙে গেল ঃ কি ব্যাপার কি? জানবার জন্য তখনই তিনি তার দুই জন সেবককে নীচে পাঠালেন। তারা ফিরে এসে জানোলো—কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে এক যুবকের মৃত্যু ঘটেছে। ঐ মর্মন্তুদ কান্না তারই শোকার্তা জননীর। অনেক চেষ্টা করেও কেউই তার এ কান্না থামাতে পারছে না।

এ কথা শুনবার পর অমরদাস চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ রইলেন, প্রার্থনা জানালেন শ্রীভগবানের চরণে, তারপর চোখ মেলে সেবক দুটিকে বললেন তোমরা দু'জন গিয়ে মৃতের সামনে বসে ভক্তিভরে মৃতের মুখে কিছুটা জল ঢেলে দাও, প্রভুর কৃপায় সে আবার পুনর্জীবন লাভ করবে।

আদেশ পাবার পর সেবকদুটির মনে হ'ল এই মৃত যুবকটি যদি প্রাণ ফিরে পায় তা গুরুজীর যোগ বিভূতির বলেই পাবে, আমরা ত শুধু উপলক্ষ্য মাত্র। জপ আবৃত্তি করে আর মুখে জল ঢেলে দিয়ে আমরা আর কি করতে পারি? সুতরাং মৃত যুবকটিকে গুরুর সামনেই হাজির করা যা'ক, যা কিছু করবার নিজেই করুন!

এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা তখনই গিয়ে মৃতদেহটিকে গুরুর সামনে নিয়ে এল। সঙ্গে এল বহু কৌতূহলী নরনারী। অমরদাস ভাবাবিষ্ট অবস্থায় শোকার্তা জননীর কান্না শুনে চোখ মেললেন। সামনে মৃতকে দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি তার সামনে এসে বসে মন্ত্রপূত বারি বার-বার সিঞ্চন করতে লাগলেন তার প্রাণহীণ দেহে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যুবকের চোখের পাতা এবং দুই ঠোঁট কাঁপছে, তার পরেই দেহে ফিরে এল তার প্রাণের স্পন্দন। এরপর কিছুটা জল পান করানোর পরই সে উঠে বসলো। গুরুর এই অত্যাশ্চর্য লীলা দেখে সমবেত জনতা আনন্দে গুরুর জয়ধ্বনি দিয়ে

উঠল। যুবকের জননী সাশ্রুনয়নে আবেগভরা হৃদয়ে লুটিয়ে পড়ল গুরু অমরদাসের চরণ তলে।

০ ০ ০ ০

অমরদাস ধ্যানাবস্থায় থাকবার সময় পরম গুরু নানকজী তাঁকে একবার দর্শন দিয়ে বলেন, শিখমণ্ডলীর কল্যাণের জন্য তুমি একটি পবিত্র কূপ খনন করিয়ে তীর্থ-ভূমি প্রতিষ্ঠা করো।

এই প্রত্যাদেশ পেয়েই অমরদাস তাঁর আশ্রমের নিকটে কিছু জমি কিনে শুভ সংকল্প নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে ভক্ত শিষ্যদের সাহায্যে এই কূপ খননের কাজ সুরু করে দেন।

দিনের পর দিন শত শত শিখের উদয়াস্ত পরিশ্রমে কূপ খননের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হ'ল বটে কিন্তু জলধারা উৎসারিত হ'ল না। হবে কি—কূপের সর্বনিম্নস্তরে দেখা দিয়েছে এক বিরাট পাথরের স্তূপ। এটাকে কোন মতে ভেদ করতে না পারলে জল উঠবার কোন সম্ভাবনা নেই।

খননরত ভক্ত শিখেরা সমস্যাটি গুরু অমরদাসের গোচরে আনলে তিনি বললেন, ঠিক আছে পাথরের বিশেষ একটি স্থান আমি চিহ্নিত করে দিচ্ছি। তোমাদের কেউ নীচে নেমে একটা লৌহকীলকের সাহায্যে সেখানটায় একটা ছিদ্র করে দাও। তা হ'লেই সেখান থেকে জল উঠবে বটে কিন্তু এ কাজ করতে যাওয়ায় বিপদ আছে, তাও আগে থেকে বলে রাখছি। ছেঁদা করার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের স্তরটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। জল উঠবে প্রচণ্ড বেগে। যে কীলক প্রবেশ করাবে তার হবে জীবন বিপন্ন ঃ প্রচণ্ড বেগে উত্থিত জলরাশি তাকে সজোরে নিক্ষেপ করবে।

গুরুর মুখে এই কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে গেল। গুরু এবার প্রশ্ন করলেন, এখন তোমাদের মধ্যে কে এ কাজে এগিয়ে আসবে বলো। নিজের জীবন বিপন্ন করে এই পুন্য কওয়ালির কাজকে কে পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে?

শুনে কারোই মুখে কথা নেই, সবাই পুতুলের মতে দাঁড়িয়ে। এমন

সময় গুরুর এক প্রিয় শিষ্য মানকচাঁদ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে বললে, গুরুজী, এ কাজের ভার আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। শিষ্যমণ্ডলীর কল্যাণে আপনি যে পুণ্যকর্ম সুরু করেছেন তা শেষ করতেই হবে, বিপদের ভয়ে পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন ?

এই বলে বৃহৎ এক লৌহ কীলক নিয়ে মানকচাঁদ নির্ভয়ে কওয়ালির নীচে নেমে গিয়ে পাথরের স্তরের যেখানটা গুরু চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন সেখানে পুতে দিতে অমনি পাথর গেল ভেঙে, সঙ্গে সঙ্গে নীচের অবরুদ্ধ জলস্রোত বাধা মুক্ত হয়ে প্রচণ্ড বেগে নির্গত হয়ে মানকচাঁদের দেহটা ছুড়ে দিল কূপের সুদৃঢ় কঠিন বেষ্টনীর গায়ে। একটু পরেই দেখা গেল তার নিস্পন্দ দেহ জলের উপর ভাসছে। ভক্তেরা সব - হায় হায় করতে লাগল।

খবর পেয়ে মানকচাঁদের মা ও স্ত্রী পাগলের মত ছুটে এসে কওয়ালীর পাশে দাঁড়িয়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

দুঃসংবাদটি গুরু অমর দাসের কাছে পৌঁছতেই তিনি দ্রুত কওয়ালির কাছে ছুটে এলেন। কিছুক্ষণ তিনি মানকচাঁদের ভাসমান দেহের দিকে তাকানোর পর তাঁর জননী এবং স্ত্রীর দিকে চেয়ে আশ্বাসভরা কণ্ঠে বললেন, মানকচাঁদের মৃত্যু কি করে হবে গো ? ভগবান তাকে দিয়ে যে বহু লোকের ত্রাণ করবেন ? তাকে তিনি অবশ্যই জীবনদান করবেন।

এই কথা বলবার পর অমরদাস নিজেই কওয়ালির ভেতর নামলেন, নেমে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, মানকচাঁদ, তুমি অমন করে জলের উপর পড়ে আছ কেন, তুমি যে আমার জীয়র ( জীবিত ) ছেলে, চোখ মেলে চাও একবার আমাদের দিকে, দেখছ না তোমার মা এবং তোমার স্ত্রী তোমার জন্য কেঁদে আকুল। ওঠ, উঠে—এস তুমি আমাদের কাছে।

উপস্থিত ভক্তেরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল এবার গুরুর অত্যাশ্চর্য যোগৈশ্বর্য। দেখতে না দেখতে মানকচাঁদের দেহে প্রাণের স্পন্দন সুরু হয়ে গেল। কওয়ালির সিঁড়ির কাছে এসে সে চোখ মেলে চাইল। সবাই তখন তাকে ধরাধরি করে গুরুর দরবার ঘরে এনে শুইয়ে দিল। ভক্ত শিখেরা অমনি উল্লাস ভরা উচ্চ কণ্ঠে বার বার ধ্বনি

তুললো 'ওয়া—গুরু' —'ওয়া গুরু'।

৹ ৹ ৹ •

প্রেমা এক হতভাগ্য ক্ষত্রিয় যুবক। তাকে হতভাগ্য বলা হ'ল এই জন্যে যে অতি বাল্যকালেই সে তার মা বাপকে হারায়। গ্রাসাচ্ছদনের জন্য পৈতৃক যে সম্পত্তি ছিল তাকে ছেলেমানুষ পেয়ে আত্মীয় স্বজনেরা সে সব জবর দখল করে নেয়। বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করে তার দিনযাপন করতে হয়। এরপর তার জীবনে আসে দৈবের এক কঠিন আঘাত ঃ জঘন্য কুষ্ঠরোগে সে আক্রান্ত হয়।

প্রেমা লোক মুখে শোনে গুরু অমরদাসের সিদ্ধ জীবনের নানা বিস্ময়কর কাহিনী। শুনে তার মনে হয় এই মহাপুরুষ কত লোককে উদ্ধার করেছেন, মারাত্মক রোগের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, আমার মত অসহায় আভাজনের প্রতি কি কৃপাদৃষ্টি পড়বে না?

আশায় বুক বেঁধে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে কোন মতে পথ চলে সে শিখনগর গোবিন্দোয়ালে এসে হাজির হয়। এসে দেখে ধর্মের নূতন প্রেরণা পেয়ে শিখ ভক্তেরা এখানে ভাবে মাতোয়ারা। কেউ বা ভজন গাইছে, কেউ বা ভাবোন্মত্ত হয়ে নাচছে। অনেকে চক্রাকারে বসে গুরুর রচিত আনন্দ্, মোহিলা এবং স্তবগান গাইছে। বড় ভাল লাগল প্রেমার। এ যেন এক আনন্দের মেলা।

কেমন আবেগ এসে গেল প্রেমার মনে। সেও গুরুর উদ্দেশে তখনই এক স্তবগান রচনা করে অশ্রুসিক্ত নয়নে বার-বার তাই গাইতে লাগল। দেখে রাস্তায় ভিড় জমে গেল।

আশেপাশে যে সব বর্ষীয়ান শিখ এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের কাছে প্রেমা মিনতি জানাল ঃ আপনারা আমায় গুরুর দর্শন এবং কৃপা-লাভের ব্যবস্থা করে দিন, আমি যে তাঁর কাছে এক নতুন জীবন ভিক্ষা করতে এসেছি।

তাঁরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, হবে, হবে, অপেক্ষা করো তুমি, গুরুর লঙ্গরখানায় আহার করো, গুরু নিজেই তোমাকে ডেকে নেবেন। অন্ধ আতুর মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের দর্শন দানের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা আছে এখানে,ঐদিন তোমারও গুরুদর্শন মিলবে।

প্রেমা ভাগ্যবান, সেই নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হ'ল না। এক অন্তরঙ্গ ভক্তের মুখে প্রেমার চরম দুর্ভাগ্যের কথা সেই সঙ্গে তার গুরুর স্তব রচনা এবং ভাবোদ্বেল কণ্ঠে তা গেয়ে শোনানোর কথা গুরুর কানে যেতে তিনি প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন, প্রেমা তার চিরন্তন দিব্য সত্তা খুঁজে পেয়েছে, এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাগ্যের পরিবর্তনও সুরু হয়ে গিয়েছে। এখানকার আশীর্বাদ সে অবশ্য লাভ করবে। কাল ভোরে আমার স্নান করা বিপাশার জলে তার দেহ বেশ ভাল করে ধুইয়ে দাও, তারপর তার ঘায়ের জায়গাগুলি ভাল পরিষ্কার কাপড়ের ফালি দিয়ে বেঁধে দাও। অবসর মত আমি নিজেই গিয়ে তাকে দেখে আসব।

গুরুর নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হ'ল। পরদিন অমরদাস তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে নিজেই গিয়ে প্রেমাকে দর্শন দিলেন। কিছুক্ষণ তার দিকে করুণা ভরা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তার পাশে গিয়ে বসলেন তারপর নিজে হাতে তার ঘায়ের বন্ধনীগুলি খুলে ফেললেন। কি আশ্চর্য—প্রেমার গায়ে কুষ্ঠরোগের কোন চিহ্নমাত্র নেই; ত্বকের বর্ণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, উজ্জ্বল।

প্রেমা গুরুকৃপায় রোগমুক্ত হয়ে তাঁর প্রশস্তি গাইতে গাইতে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

গুরু শিষ্যদের দিকে সহাস্যে চেয়ে বললেন, প্রেমা ভগবৎ কৃপায় নতুন দেহ, নতুন জীবন পেল, আর ওকে প্রেমা বলে ডাকা কেন, আজ থেকে ওর নাম হ'ল মুরারী। এখন থেকে ঐ নামেই ডাকবে তোমরা ওকে।

° ° ° °

তালতখান্দিতে অমরদাসের এক অনেক দিনের পুরনো ভক্ত বাস করে। তার একটা পা একেবারে অসাড় অকেজো। একটি পা নিয়েই সে প্রতিদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে গোবিন্দোয়ালে গুরুকে দর্শন করতে আসে এবং দর্শন করেই আবার তেমনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজের বাড়ীতে ফিরে যায়। রাস্তার লোকেরা তাকে লেঙড়া বলে ডাকে। অনেকে তাকে এত কষ্ট করে গোবিন্দোয়ালে যাতায়াত করতে দেখে

ব্যঙ্গ করে বলে, তোর গুরুর এত ক্ষমতা আর মাহাত্ম্যের কথা শুনি, তা আজ পর্যন্ত তিনি তোর একটা পা সারিয়ে তুলতে পারলেন না? আর আশ্চর্য তুই ঐ গুরুকে দর্শন করতে হিঁচড়ে হিঁচড়ে বোকার মত রোজ গোবিন্দোয়ালে ছুটিস ঃ একটুও লজ্জা করে না তোর?

লেঙড়া উত্তরে বলে, আমার খোঁড়া পা ভাল করবার জন্য শিখধর্ম্ম নিয়েছি নাকি আমি? এই তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য গুরুর কাছে প্রার্থনা জানাব নাকি আমি?

গ্রামের চৌধুরী একদিন আর কয়েকজনের সঙ্গে মিলে লেঙড়াকে একটু বেশি মাত্রায় ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। বেচারা লেঙড়া সেদিন আর নিজেকে সামলাতে না পেরে গুরুর কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার দুঃখের কথা বিবৃত করে।

তাকে এই উৎপীড়নের কথা শোনা মাত্র অমরদাসের দুটি চোখ অমনি জ্বলে উঠল, তিনি শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে লেঙড়াকে বললেন, তোমার খোঁড়া পা এবার ভাল না করে আর চলছে না দেখছি। বেশ, তুমি এক কাজ করো ঃ তুমি এখনই বিপাশার তীরে চলে যাও। পাশেই তার যে বন, সেই বনে গেলে দেখতে পাবে তুমি এই প্রাচীন ফকিরকে। নাম তাঁর হুসেনীশাহ। ফকির বড় কর্কশভাষী এবং রীতিমত উগ্র মূর্তি। তাঁর কথাবার্তা শুনে এবং রূঢ় আচরণ দেখে তুমি ভয় পেয়ো না কিন্তু। তাঁর কাছে গিয়ে এ নির্যাতনের কথা তাঁকে খুলে বলবে, আর বলবে গুরু বলেছেন তোমার এ খোঁড়া পা ভাল করে দিতে।

লেঙড়া গুরুর নির্দেশে বিপাশার তীরে গিয়ে বনে প্রবেশ করে সেই প্রাচীন ফকিরকে দেখতে পেল। সবারই জানা যে কেউ ফকিরের সামনে গেলে তিনি ক্ষেপে গিয়ে কদর্য ভাষায় তাকে গালাগালি দিতে থাকেন। কিন্তু লেঙড়া তার সামনে গেলে তাঁর মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, তিনি একদৃষ্টে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। কোন কটুবাক্য করলেন না। লেঙড়া এতে সাহস পেয়ে সবিস্তারে নিজের দুঃখের কাহিনী এবং গুরুর নির্দেশের কথা ফকিরকে জানালো। লেঙড়ার বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ফকিরকে একটু আগে যে শান্ত মূর্তিতে দেখেছিল সে শান্ত মূর্তি তার আর নেই। মারমুখী

হয়ে চীৎকার করে তিনি একটা লাঠি দিয়ে লেঙড়াকে আঘাত করতে উদ্যত হ'লেন। ভয় পেয়ে লেঙড়া নিজের লাঠিটা ফেলেই সেখান থেকে দৌড়াতে সুরু করলো।

একটু দৌড়ানোর পরই সে দেখে আরে একি, তার খোঁড়া পা'ত আর নেই। তার খোঁড়া পা যে বেমালুম একেবারে ভাল পা হয়ে গেছে: অসাড় অঙ্গটি কোন যাদু মন্ত্র বলে একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

কৃতজ্ঞতা জানাতে অশ্রু সজল চোখে ফিরে এল সে ফকির হুসেনী-শাহের কাছে।

ফকির সাহেব তখন শান্তকণ্ঠে তাকে বললেন, ওরে তোর গুরু অমরদাস যখন তোকে আমার কাছে আসতে বলেছে—তখনই ত তোর জখম পা-টা ভাল হয়ে গিয়েছে। তোর গুরুরই কাজ এ। সে নিজে আড়ালে থেকে কত কিছু করবে, আর এই সব সিদ্ধাইয়ের দুর্ণাম চাপাবে পাগল হুসনীশাহের উপরে। একটা কথা তোকে বলে রাখছি মনে রাখবি। আমার মত খোদার বান্দা এখানে ওখানে কতই খুঁজে পাবি, কিন্তু গুরু অমরদাসের মত এমনটি খুব কমই পাবি।

# তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

আচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—তন্ত্রসাধনায় বিচারপতি সার জন উডরফের গুরু। এই মহাসাধকের জীবনের দুই একটি অলৌকিক ঘটনা শুধু এখানে বিবৃত করা হল—

সাধনার একরকম প্রায় গোড়ার দিকেরই কথা। বাড়ি গড়াই নদীর ধারে কুমারখালি। বাড়ির অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল নয়, কোনদিন অন্ন জোটে, কোনদিন জোটে না—কিন্তু সাধক শিবচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি তন্ত্রাচারে মায়ের পূজা, ধ্যান এবং রামপ্রসাদের মত স্বরচিত মায়ের গুণগান নিয়েই বিভোর হয়ে থাকেন।

একদিনের কথা। ঘরে অন্নের সংস্থান নেই অথচ তিনি ভাবাবেশে মত্ত হয়ে আপন মনে স্বরচিত মায়ের গান গাইছেন—কবে গো আনন্দময়ী, এ দীনে সে দিন দিবে—এমন সময় তার সহধর্মিনী তার ক্রন্দনরত শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছেন, কিন্তু আচার্যের গান আর শেষ হয় না দেখে তিনি একবার এগুচ্ছেন, একবার পিছুচ্ছেন। অবশেষে যখন গান শেষ হ'ল তখন তিনি স্বামীর সামনে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, গান ত দিব্বি গেয়ে চলেছ, কিন্তু দুটো ভাতের যোগাড় হবে কি করে? নিজে ত দু'দিন না খেয়ে বাচ্চা মেয়েটাকে যদিও বা কোনরকম কিছু খেতে দেওয়া গেলে, কিন্তু আজ ত তার জন্যও কোন কিছুর ব্যবস্থা নেই। এ ব্যবস্থা কে করবে।

শিবচন্দ্রকে কিছুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না, প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, ছাখো, মা সর্বমঙ্গলা তার এ জগৎটা তোমার আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সৃষ্টি করেন নি। কার সংসার তিনি কি করে চালাবেন—তা তিনি নিজেই জানেন। চালাবার শক্তি তার অতি অবশ্য আছে। এ নিয়ে তোমার আমার মাথা ঘামানোর কি কোন প্রয়োজন আছে?

পত্নী ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, তোমার এই সব বড় বড় কথায় কারো পেট ভরে না, মা সর্বমঙ্গলার আর বসে বসে কাজ নেই তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্র মানুষের সংসার কি করে চলবে তাই ভাবতে যাচ্ছেন।

হাসালে তুমি গিন্নী, বলে উঠলেন শিবচন্দ্র,—এই অনন্ত কোটি গ্রহনক্ষত্রে তিনি যেমন আছেন তেমনি আছেন বিশ্বের অনুপরমাণুতে, তাঁর যে কোন কিছুর কথা, কারো কথাই ভুলবার উপায় নেই। মা আমার সর্বমঙ্গলা—একটা ব্যবস্থা তিনি করবেনই।

বিদ্যার্ণবের কথা শেষ হতে না হতে গ্রামের পোষ্টমাষ্টার শশধর চক্রবর্তী সেখানে এসে হাজির। শিবচন্দ্র তাঁকে দেখে স্মিতহাস্যে বলে উঠলেন, হঠাৎ কি মনে করে ভাই?

পোষ্টমাষ্টার বললেন, পিওনের অসুখ, তাই আজ সে কাজে বেরোয় নি। তাই বাড়ি ফিরবার পথে আমিই হয়ে যাচ্ছি আপনার এখানটা: আপনার একটা টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার, আর একখানা চিঠি আছে।

প্রথমে চিঠিটাই পড়লেন শিবচন্দ্র। এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে, লিখেছেন গোরক্ষপুরের এক ভক্ত। তিনি লিখেছেন, ঘুমিয়ে আছি, গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে মা সর্বমঙ্গলা মণ্ডপ আলো করে বসেছেন। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, কুমারখালিতে আমার ছেলে শিবচন্দ্রকে একশো টাকা তুমি অবিলম্বে পাঠিয়ে দাও, তাঁর বাড়ির সবার অনাহারে মরবার মত অবস্থা।

শিবচন্দ্র পোষ্টমাষ্টারের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে সহধর্মিণীর দিকে ঠেলে দিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, দেখলে ত সন্তানের উপর থেকে মায়ের দৃষ্টি কি কখনও সরে যায়।

° ° °

শ্রীবসন্ত কুমার পাল আচার্য শিবচন্দ্রের শুধু অনুরাগী ভক্ত ছিলেন না, ছিলেন তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ও অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী। শ্রীপাল ১৩৭৩ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠের হিমাদ্রি পত্রিকায় শিবচন্দ্রের কুল-

কুণ্ডলিনী পূজার যে বিবরণ দিয়েছেন—তা পড়তে গেলে সাধারণের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। শ্রীপাল যা লিখেছেন—এখানে সংক্ষেপে আমি তার বিবৃতি দিচ্ছি—

শিবচন্দ্র প্রতিদিন তাঁর আরাধ্যা সর্বমঙ্গলা দেবীর যে পূজা করতেন তার এক অপরিহার্য অবশ্য অনুষ্ঠান অঙ্গ ছিল তন্ত্রোক্তমতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পূজা এবং ভোগ নিবেদন। ঐ ভোগের উপকরণাদির মধ্যে প্রধান ছিল কাঁচা দুধ, উৎকৃষ্ট সুপক্ক কদলী ও পরমান্ন। কুলকুণ্ডলিনী পূজাটি হ'ত শিবমন্দিরে শিবের কাছে বসে। ভোগ নিবেদনের সময় শিবচন্দ্র যখন চোখ বুজে ধ্যানে বসতেন তখন প্রতিদিনই দেখা যেত কোত্থেকে পাঁচ ফুটের মত লম্বা একটা গোখরো সাপ এসে আচার্যের নিবেদিত ঐ দুধ কলা এবং পরমান্ন খাচ্ছে। কোন কোন দিন একটা সাদা রঙের সাপও আসত এর সঙ্গে। শ্বেত সর্পটিকে কিন্তু রোজ দেখা যেত না। যা হ'ক ভোগপ্রসাদ বেশ পরিতোষ সহকারে আহার করবার পর রোজই দেখা যেত সাপটি ধ্যানে উপবিষ্ট শিবচন্দ্রের মাথাটা পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠে তাঁর সামনে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে দুলছে।

ভাবাবিষ্ট শিবচন্দ্র তখন অর্ধোন্মীলিত চোখে বলতে থাকেন, আয় মা, আয় মা —এলি ? ব্রহ্মময়ী তারা মা আমার, আয় আয়।—এমনি করে আদরের ডাক ডাকতে ডাকতে শিবচন্দ্র সাপটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকলে সাপটা তখন তাঁর কোলে উঠে কুণ্ডলী পাকিয়ে বিরাট ফণা মেলে হিস হিস শব্দ করতে করতে ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকত। এর একটু পরেই শিবচন্দ্রের কখনও দক্ষিণ বাহু কখনও বাম বাহু বেষ্টন করে উপরে উঠে তাঁর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে ফণা আবার মেলে তাঁর বুকের উপর মাথা রেখে কি যেন কান পেতে শুনতে থাকে। শিবচন্দ্র তখন ভাবে আত্মহারা হয়ে তারা-তারা-তারা বলে তাঁর আরাধ্যাকে স্মরণ করতে করতে সাপের মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে থাকলে সাপটি তার কণ্ঠ ছেড়ে মাথায় উঠে কয়েকবার বিস্তৃত ফণার দোল দিয়ে সামনের শিবলিঙ্গের মাথায় উঠে সেখানেও কয়েকবার তার বিস্তৃত ফণার দোল দিয়ে কিছুক্ষণ থেকে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়।

সাপটি চলে যাবার পর বিদ্যার্ণব ভোগের ভুক্তাবশিষ্ট থেকে প্রসাদ নিয়ে অশ্রুনেত্রে তারা তারা বলতে বলতে তা গ্রহণ করতেন। প্রথম দিকে সবাই তাকে এই প্রসাদ গ্রহণে বিরত থাকতে অনুরোধ এমন কি মিনতি করেছে, কিন্তু তিনি সে সবে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে নির্ভয়ে এবং পরমানন্দে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করতেন। এ যে রীতিমত দুঃসাহসিক কাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

# কৃষ্ণ প্রেম

কৃষ্ণ প্রেমের পূর্বাশ্রমের নাম রোনাল্ড নিকসন। তরুণ, ইংরেজ কেমব্রিজের প্রতিভাধর ছাত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশ রক্ষার তাগিদে তিনি রয়াল এয়ার ফোর্সে যোগ দেন। জার্মানীর ভয়াবহ আক্রমণ রোধ করবার জন্য ইংরেজরা যে একটি ক্ষুদ্র বিমান বাহিনী গড়ে তোলেন, নিকসন হয়েছেন তারই এক বিমান চালক। দক্ষ দুঃসাহসী পাইলট নিকসন।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জার্মান অধিকৃত বেলজিয়মের একটা শত্রু-ঘাটিতে আঘাত হানতে চলেছেন তিনি আরও কয়েকজন বম্বার প্লেনের চালকদের সঙ্গে।

বেলজিয়াম ঢুকবার আগেই এক গুপ্ত ঘাটি থেকে এক ঝাঁক জার্মানী ফাইটার বিমান নিকসনের পিছু ধাওয়া করেছে,—প্রচণ্ড বেগে। নিকসন প্রথমে তা লক্ষ্যই করেনি।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল সুদূর আকাশের কোণে : দুর্ধর্ষ জার্মান ফাইটারগুলি তাঁকেই ঘেরাও করতে তীব্রবেগে ছুটে আসছে। একা এতগুলি ফাইটারের সঙ্গে লড়া ত কিছুতেই সম্ভব নয়। এখন উপায় ?

সেই সংকট মুহূর্তে কী করা যায় ভেবে যখন নিকসন দিশে পাচ্ছেন না তখন হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য : তুষারাবৃত এক উত্তুঙ্গ পর্বত সূর্যালোকে ঝলমল করছে, আর তারই কন্দর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শুভ্রোজ্বল দিব্য আলোকধারা। সেই আলোতে যেন ডুবে গেল রোনাল্ড নিকসনের সমগ্র সত্তা। কেমন এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে অনুভব করলেন তিনি যেন নিজে আর নিজের আয়ত্তে নেই। কোথাকার এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে অধিকার করে বসেছে তাঁর ইচ্ছাশক্তি আর হস্তপদের উপরে। এই শক্তিই এখন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিকসনের দেহ। আকাশে

—ঊর্ধে—অনেক অনেক ঊর্ধে উঠে গেল নিকসনের প্লেন—তারপর ঘুরে বিপরীত দিকে চলতে সুরু করল। কে চালাচ্ছে তাঁর প্লেন, কোন দিকে সে সম্বন্ধে কোনই ধারণা নেই নিকসনের। আসলে তাঁর চেতনাই তখন তাঁর পূর্ণ আয়ত্বে নেই। বাহ্য জ্ঞান ফিরে এলে তিনি দেখেন বিমানের ককপিটে তিনি আর বসে নেই, রয়েছেন তিনি লণ্ডনের কাছাকাছি এক সামরিক হাসপাতালে।

তাঁর বিমানটি অবশ্য নিরাপদেই ইংল্যাণ্ডের বিমান ঘাটিতে অবতরণ করে, দেখা যায় পাইলট নিকসন মূর্ছিত অবস্থায় ককপিটে ঢলে পড়ে আছেন। সেদিনকার অভিযানে নিকসনের সঙ্গী পাইলটদের অনেকেই মারা গেছেন, অনেক বৃটিশ বিমান হয়েছে বিধ্বস্ত। শত্রু-ব্যূহের কাছাকাছি গিয়েও কি অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপে নিকসন এমনি করে নিরাপদে ফিরে আসতে পারলেন—সে এক পরম বিস্ময়।

অলৌকিকত্বে কোন দিন বিশ্বাস করতেন না নিকসন, কিন্তু এ তাঁর জীবনে কী হ'ল, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কি করে রক্ষা পেয়ে গেলেন তিনি। আর ঐ নিদারুণ জীবনসংকটে যে দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠল, তার মানেই বা কী? হাসপাতালে আসবার পরও একাধিকবার স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন তিনি সেই সৌরকরোজ্জল অভ্রভেদী পাহাড়ের চূড়া, যেখান থেকে নির্গত হচ্ছে এক দিব্য শুভ্র জ্যোতির ধারা। পরে অবশ্য ঐ বিশাল পর্বতের পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন বারবার তাকে বলতে থাকে—হিমালয় দেখেছ তুমি তোমার অলৌকিক দর্শনের মধ্যে। ভারতের দেবতাত্মা হিমালয়—কন্দরে কন্দরে তার যে সব যোগী ঋষি থাকেন তাদেরই কৃপা তোমায় সেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

অতীন্দ্রিয়ে যে দেশের দেখা মিলেছে, নিকসন অতঃপর হৃদয়ের তাগিদে সেই দেশেই এসেছেন। সেই ভারতবর্ষে পরে সিদ্ধা গুরু তার যশোদা মাঈর কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে কৃষ্ণ প্রেম নামে আখ্যাত হ'য়ে হিমালয়ের অঙ্কে দীর্ঘকাল তার গুরু যশোদা

মাঈর সঙ্গে বাস করে হিমালয়েই দেহ রেখেছেন।

সিদ্ধা গুরুর কৃপায় এবং নিজের একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে কৃষ্ণ প্রেম নানা সময় নানা ধরণের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। দুই-একটির কথা এখানে বলা যাচ্ছে।

ঠাকুরের ভোগ তৈরী কৃষ্ণপ্রেমের ছিল খুব একটা প্রিয় কাজ। অধিকাংশ দিন এ ভোগ কৃষ্ণপ্রেম অতি শ্রদ্ধাভরে নিজে প্রস্তুত করতেন। বড় আনন্দ পেতেন তিনি এতে। একদিন আশ্রমে উৎকৃষ্ট ঘৃত সংগৃহীত হয়েছে। কৃষ্ণপ্রেম পরম যত্নে এ দিয়ে হালুয়া তৈরী করে ভোগ নিবেদন করলেন, এরপর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে প্রাঙ্গণে বসে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে জপ ধ্যান শুরু করলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানের পর কৃষ্ণপ্রেম উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে বসলেন, ঠাকুর আজ ভোগ আস্বাদন করে নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন। চলো ত সবাই গিয়ে দেখি ভোগের অবস্থা, ঠাকুর সত্যিই আজ কিছুটা খেয়েছেন কি না।

যশোদা মাঈ কাছেই বসেছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের কথা শুনে তিনি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। আশ্রমবাসী ভক্তের মন্দিরে ঢুকে ত একেবারে 'থ'। ঠাকুর স্থূলদেহীর মত সেদিনকার ভোগ সত্যিই গ্রহণ করেছেন। পরম শ্রদ্ধায় প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ঘৃতে পক্ক হালুয়ার অধিকাংশই তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বালগোপালের কচি আঙুলের ছাপটিও রয়ে গেছে তাতে স্পষ্ট।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ভক্তেরা সব আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন, তারপর সুরু করলেন ভজন আর কীর্তন।

o o o

আর একদিন কৃষ্ণপ্রেমের চোখে পড়ল আরও এক তাজ্জব ব্যাপার: খুব সকালে মন্দিরের দ্বার খুলে ঘরে ঢুকেছেন—এমন সময় শ্রীমূর্তির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি। কি অদ্ভুত, কৃষ্ণের পায়ে যে সোনার নূপুর ছিল তা ত সেখানে নেই, তা উঠেছে রাধারাণীর পায়ে, আর রাধারাণীর গলায় সোনার হারটি দুলছে কৃষ্ণের গলায়।

দেখে মহা উল্লাসে কৃষ্ণপ্রেম সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন মন্দিরের ভিতরে। আগের রাত্রে আরতি হয়ে যাবার পর সবার সামনেই ত শ্রীবিগ্রহের শয়ান দেওয়া হয়েছে, তারপর সারারাত্রি ত মন্দিরের দরজা তালা বন্ধ করেই রাখা হয়েছে। তবে ?

শ্রীবিগ্রহের এই মানুষী লীলা দেখে ভক্তদের হৃদয়ে বিস্ময় আর আনন্দের সীমা নেই। প্রেমোদ্দীপ্ত মুখে কৃষ্ণপ্রেম সবার দিকে চেয়ে বললেন, ছাখত ঠাকুর-ঠাকুরাণীর কাণ্ড। কি ভক্তের হৃদয়-মঞ্চ, কি মন্দিরে,—সর্বত্রই ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সেই একই লীলা !

o o o

জীবনের শেষ পর্যায়ে কৃষ্ণপ্রেম একরকম সব সময়েই রাধা-ভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকতেন। কীর্তনে রাধা ভাষণে রাধা এমন কি কাউকে অভিবাদন বা সম্বোধন করতে হলেও তার মুখে উচ্চারিত হ'ত—'জয় রাধে'।

কৃষ্ণপ্রেমের ভক্ত সুনীলবাবু থাকতেন এলাহাবাদে, এলাহাবাদেই তাঁর কর্মস্থল। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী আরতিদেবী দুইজনেই কৃষ্ণপ্রেমের কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করতেন। মাঝে মাঝে অফিসের কাজে ছুটি নিয়ে গুরু সন্দর্শনে সির্তোলায় আসতেন।

সেবার দুইজনেরই মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছে সির্তোলায় গিয়ে কয়েকদিন গুরুর কাছে কাটিয়ে আসেন। ইচ্ছা ত জেগেছে কিন্তু মাসের শেষ, হাতে রেস্ত নেই, পাথেয় জোগাড় হবে কি করে ?

ভক্তিমতী আরতি অতি সহজেই এ সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। হাতের বালা জোড়া বিক্রী করে তিনি রেলভাড়ার টাকা সংগ্রহ করলেন। তারপর পরমানন্দে স্বামী স্ত্রী সির্তোলায় গুরুর আশ্রমে এসে হাজির হ'লেন।

ঠাকুরের সেবা পূজা ইত্যাদি শেষ করে কৃষ্ণপ্রেম যখন বাহির আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন—হাতে তাঁর এক জোড়া সোনার বালা। সুনীল এবং আরতি তাঁর কাছে আসতেই তিনি আরতির দিকে চেয়ে

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, আরতি তুমি ঠিক করে বলো ত তোমার হাতের বালা দু'গাছার কি হ'ল ? সত্যি করে বলবে।

গুরুর এ প্রশ্নের উত্তরে আরতির মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না, লজ্জায় আড়ষ্ট হ'য়ে মাটির দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃষ্ণপ্রেম এবার স্মিতহাস্যে আরতির দিকে চেয়ে বললেন, শোন আরতি, রাধারাণী এইমাত্র আমায় তোমার সব কথা জানিয়ে দিলেন। সির্তোলায় আসবার খরচপত্র তোমরা তাড়াতাড়ি যোগাড় করতে পার নি, আসবার প্রবল আগ্রহে তোমার হাতের বালা বিক্রি করে তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করেছ। তাই রাধারাণী আমায় এইমাত্র বললেন, আমার হাতের বালা জোড়া খুলে নিয়ে আরতিকে দাও, ওর হাত দুটো বড় নেড়া-নেড়া দেখাচ্ছে।

যশোদা মাঈ এবং কৃষ্ণপ্রেমের তপস্যায় উত্তর বৃন্দাবনের মন্দিরের রাধারাণী সত্যই জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন।

o o o

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কৃষ্ণপ্রেম সেবার দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন। মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরী হয়ে এসে গেলেন তিরুভন্নামালাই-এ মহর্ষি রমণের আশ্রমে। মহর্ষির পথ হচ্ছে জ্ঞানমার্গ আর যশোদামাঈর শিষ্য কৃষ্ণপ্রেমের পথ প্রেমের। দুইয়ে পার্থক্য প্রচুর, তবুও আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ রমণের উপর কৃষ্ণপ্রেমের চিরদিনই অগাধ শ্রদ্ধা। এবার মহর্ষি রমণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে তাঁর যে দিব্য অনুভূতি হয় তার বিবরণ বিভিন্ন সময়ে কৃষ্ণপ্রেম তাঁর ভক্তদের কাছে দিয়েছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে।

মহর্ষির আশ্রমে গিয়ে আহার ও বিশ্রামের পর কৃষ্ণপ্রেম মহর্ষির হল ঘরে তাঁকে প্রণাম করে নীচে এক পাশে বসে ধ্যান সুরু করে দিলেন। মহর্ষি তখন তাঁর ঘরে অর্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। দুই নয়নের দৃষ্টি তখন তার কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকে উধাও। মুখে দিব্য স্নিগ্ধ হাসি লেগেই রয়েছে। বেশ কয়েকজন দর্শনার্থী তাঁর সামনে বসে। তাঁদের কেউ বা এই আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের দিকে নির্নিমেষে

চেয়ে রয়েছেন কেউ বা প্রাত্যহিক ধ্যানে নিমগ্ন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেম কেমন এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তস্থল থেকে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন ধ্বনিত হতে লাগল,—কে তুমি, কে তুমি, কি তোমার স্বরূপ, কি পরিচয় ?

কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি আর প্রেমমার্গের সাধক, দিনরাত ইষ্টধ্যান আর বিগ্রহ সেবায় মশগুল, অন্তর্লোক থেকে উত্থিত এ প্রশ্নের প্রথম দিকে তিনি তেমন আমল দেননি। কিন্তু যাঁর কাছ থেকে এ প্রশ্ন আসছে, তিনি তাঁকে ছাড়ছেন না, চৈতন্যের দ্বারে বারবার করাঘাত করে প্রশ্ন-কর্তা তাঁর প্রশ্ন চালিয়েই যাচ্ছেন,—কে তুমি, কে তুমি,—কি তোমার স্বরূপ ?

অগত্যা ভাবাবিষ্ট অবস্থায়ই কৃষ্ণপ্রেম উত্তর দেন, আমি কৃষ্ণের নগণ্য সেবক।

এবার প্রশ্ন উত্থিত হয়—কৃষ্ণ কে, কে কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণপ্রেম উত্তরে বলেন,—কৃষ্ণ নন্দের নন্দন, প্রেমময়, রসময়, বংশীধর, ভক্তের প্রাণ।

প্রশ্ন তবুও থামে না—সমানে চলতে থাকে। কৃষ্ণপ্রেম তখন তাঁর আরাধ্যের স্বরূপের পরিধি বাড়িয়ে বলতে থাকেন, কৃষ্ণ অবতার, পরাৎপর, সারাৎসার।

প্রশ্নকারী তবুও তাঁকে রেহাই দেন না,—প্রশ্ন সমানে চলতে থাকে। অনন্যোপায় হয়ে কৃষ্ণপ্রেম তখন উত্তরের জন্য রাধারাণীর শরণ নেন। রাধারাণী তখন তাঁকে শিখিয়ে দেন—বলো কৃষ্ণ ছাড়া এ বিশ্বে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সুতরাং কে তাঁর স্বরূপ আর মাহাত্ম্যের পরিচয় দেবে। শুধু তিনিই দিতে পারেন তাঁর স্বরূপের পরিচয়। উপনিষদ ত বলেছেনই—মানুষের সাধ্য কি যে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ?

পরের দিন সকালে কৃষ্ণপ্রেম মহর্ষির হলঘরে গিয়ে তার পায়ের কাছে বসলে মহর্ষি একটু ঘুরে তার দিকে ফিরে তাঁর প্রতি করলেন প্রসন্ন মধুর দৃষ্টিপাত। সে অগাধ অতলস্পর্শী দৃষ্টি থেকে যেন স্বর্গের

সুধা অবিরাম ঝরে পড়ছে। মহর্ষি এবার মৃচকি হাসছেন। কৃষ্ণপ্রেম তখন স্পষ্ট উপলব্ধি করলেন আগের দিন তার অন্তর থেকে যে প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে, মহর্ষিই ছিলেন তার পিছনে।

ব্যাপারটা বোঝা হয়ে গেলেই কৃষ্ণপ্রেম চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অভূতপূর্ব অনাস্বাদিতপূর্ব দিব্য আনন্দে তার দেহ-মনপ্রাণ যেন প্লাবিত হয়ে গেল। এই আনন্দের আবেগ কিছুটা কেটে যাবার পর কৃষ্ণপ্রেম মহর্ষির দিকে চেয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, হে মহাত্মন্! আপনার কৃপায় এক অননুভূতপূর্ব দিব্য আনন্দের স্বাদ পেলাম। আমি অজ্ঞ, এত কৃপাই যদি করলেন আমায় তবে এ অধমের একটা সামান্য কৌতূহল নিবৃত্ত করুন আপনি: কৃপা করে বুঝিয়ে দিন—কে আপনি, কি আপনার স্বরূপ, কি আপনার তত্ত্ব?

মনে মনে এই প্রশ্নটি করবার পরই কৃষ্ণপ্রেম মুখ তুলে চাইলেন একবার মহর্ষির দিকে। অবাক কাণ্ড! কই মহর্ষি ত তার কৌচে নেই। এই এক মুহূর্ত আগে তিনি এখানে বসে, এখন নেই,—এই এতগুলি ভক্ত দর্শনার্থীর, সামনে থেকে হঠাৎ তিনি কি করে কোথায় উধাও হ'লেন? কৃষ্ণপ্রেম ভাবতে লাগলেন—এ কি তাঁর দৃষ্টিভ্রম, না মহর্ষিরই অলৌকিক লীলা!

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিজের চোখ ছুটি বন্ধ করে আবার খুলে তাকালেন তিনি মহর্ষির কৌচের দিকে। আরে, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার: মহর্ষি যে জীবন্ত শিবের মত তাঁর কৌচে ঠিক তেমনি করেই বসে রয়েছেন! মহর্ষি এবার রহস্যময় মিষ্টি হাসি হেসে কৃষ্ণপ্রেমের দিকে একবার তাকিয়েই তার মুখটি আবার অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। মহর্ষির স্থূলদেহের এ চকিত অন্তর্ধান এবং আবির্ভাব কৃষ্ণপ্রেম বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলেন। পরম শ্রদ্ধায় শির নত করে মহর্ষির উদ্দেশ্যে তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, মহাত্মন্, আপনার কৃপায়ই আমি আজ বুঝলাম—স্থূল সূক্ষ্মের বাইরে দ্বন্দ্বাতীত লোকে আপনার অবস্থান। হে আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, আপনাকে আমার প্রণাম, বারবার প্রণাম।

• • •

যশোদা-মাঈ—দেহ ত্যাগ করেছেন। তিরোধানের পরও কিন্তু তাঁর কল্যাণ-দৃষ্টি তাঁর আধ্যাত্ম তনয়ের উপর থেকে অপসৃত হয় নি। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ভক্তদের কাছে কৃষ্ণপ্রেম নিজেই এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাদের একটি হচ্ছে এই—

কুণ্ডেশ্বরের ঝর্ণার ধারে যশোদামাঈর মরদেহ সৎকার করে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম আশ্রমে ফিরে এসেছেন। সারাদিন মনোকষ্ট এবং ছুটাছুটিতে কেটেছে, দেহ ক্লান্ত। শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। প্রতিদিনকার অভ্যাস ছিল শেষ-রাত্রে উঠে তিনি ধ্যান ভজন ইত্যাদি করেন, দেহ নিদারুণ অবসন্ন থাকায় এদিন আর যথাসময়ে ঘুম ভাঙেনি। হঠাৎ কানে এল যশোদা-মাঈর কণ্ঠস্বর ; এ কি গোপাল, এখনও তোমার ঘুম ভাঙলো না ? তোমার ভজনে বসবার সময় চলে যায় যে !

এইটুকু বলেই একটু থামলেন যশোদা-মাঈ, তারপরেই আবার আশ্বাসের সুরে বললেন, গোপাল, আমি কিন্তু ঠিক আগের মতই তোমার পাশে রয়েছি।

মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড় করে উঠে বসেছেন কৃষ্ণপ্রেম, দুই চোখ হয়ে উঠেছে অশ্রুভারাক্রান্ত। কাতর কণ্ঠে তিনি তখন বলে উঠলেন মা, তুমি যদি আমার পাশেই রয়েছ তা হ'লে তোমায় আমি—দেখতে পাচ্ছি না কেন ? তুমি কি আর আমায় দেখা দেবে না ?

তা ত হয় না, বাবা, ধাপের পর ধাপ এগিয়ে তোমাকেই যে আসতে হবে আমার কাছে। ঠিক মত সাধনা চালিয়ে যাও তুমি। যথা সময়ে এই লোকে এসে আবার তুমি আমার দেখা পাবে।

অদৃশ্য লোকের ঐ স্তর থেকে বিদেহী যশোদামাঈ আরো কিছুকাল তাঁর গোপালকে সাধনার নির্দেশাদি দিয়েছেন, পরে তাঁর এই কণ্ঠস্বর আর শুনতে পান নি কৃষ্ণ প্রেম।

যশোদামাঈর ছোট মেয়ে মতিরাণীকে নিয়ে কৃষ্ণপ্রেম তখন বৃন্দাবনে। তাঁদের আমন্ত্রণে ভক্ত ডঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়ও সেখানে উপস্থিত। সবাই মিলে এক সঙ্গে কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরছেন, ঠাকুর দর্শন করছেন। ভজন কীর্ত্তন করছেন, অবসর সময় কৃষ্ণকথা আলোচনা

করছেন। দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটছে।

হঠাৎ একদিন গোবিন্দ গোপালের দাদার এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। থাকেন তিনি বৈদ্যনাথ ধামে, কৃষ্ণপ্রেমের অনেক দিনের বন্ধু। টেলিগ্রামে তিনি কৃষ্ণপ্রেমকে অনুরোধ জানিয়েছেন সির্তোনায় ফিরবার আগে কৃষ্ণপ্রেম যেন অতি অবশ্য তাঁর ওখানে একবার হয়ে যান।

সেখানে যাওয়া সম্বন্ধে বেশ সোৎসাহে আলাপ আলোচনা চলছে এমন সময় কৃষ্ণপ্রেম হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার ভেতর থেকে আসি।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণপ্রেম নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বললেন, এই মাত্র মায়ের নির্দেশ পেলাম আমি। তিনি আমাদের সরাসরি সির্তোলায় চলে যেতে বললেন। বললেন, একটা জরুরী ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদের সির্তোনায় হাজির হওয়া দরকার।

মায়ের নির্দেশে কৃষ্ণপ্রেম সির্তোনায় গিয়ে দেখেন ভারপ্রাপ্ত পূজারীটি আগের দিন আশ্রম থেকে পালিয়েছে। সেদিন তারা সির্তোনায় হাজির না হ'লে ঠাকুরের পূজার্চনা এবং ভোগ-আরতি কোন কিছুই হ'ত না।

# রূপ গোস্বামী

প্রভু শ্রীচৈতন্য রূপ ও সনাতনকে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের নির্দেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছেন লুপ্ত বিগ্রহের উদ্ধার ও তাঁর সেবার নির্দেশ। সনাতন মথুরার চৌবেজীর গরিব বিধবার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন—মদন গোপাল বিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহ কৃপা করে চৌবেজীর স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখিয়ে এক রকম নিজেই এসেছেন সনাতনের কাছে।

এরপরই আসে রূপ-গোস্বামীর গোবিন্দদেব বিগ্রহ পুনরুদ্ধারের কথা। ব্রজমণ্ডলে প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন অষ্টবিগ্রহের মধ্যে এইটিই সর্বপ্রধান। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভের পরে এই বিগ্রহ আত্মগোপন করে সুদীর্ঘ কাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকেন, এরপর রূপগোস্বামী তাঁকে কি করে উদ্ধার সাধন করে নিজেই তাঁর পূজার ভার গ্রহণ করেন সে কাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি আলৌকিক।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করে রূপগোস্বামী জানতে পারেন এই প্রসিদ্ধ বিগ্রহটি রয়েছেন বৃন্দাবনের যোগপীঠে। গ্রন্থে বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ রূপের হৃদয় সিংহাসন জুড়ে বসেন। কিন্তু কোথায় প্রাচীন কালের সেই যোগপীঠ, কোথায় কোন গহন অরণ্যে বা নদীগর্ভে ঐ বিগ্রহ আত্মগোপন করে আছেন—সে কথা তাঁকে কে বলে দেবে।

যখন যেখানেই থাকুন না কেন দীন বৈষ্ণব রূপ রোজ তাঁর নিয়মিত জপধ্যান সারার পর তাঁর আরাধ্যের কাছে আকুল প্রার্থনা জানান, হে আমার 'প্রাণের ঠাকুর, কোথায় তুমি লুকিয়ে আছ, আমায় তার সন্ধান দিয়ে এই ভক্তদিগের প্রাণ বাঁচাও।'

এই প্রার্থনা শুধু একদিন নয়, চলে দিনের পর দিন প্রতিদিন! রূপের ইষ্টদেব একদিন শুনলেন তাঁর সেই প্রার্থনা। সেদিন তিনি যমুনার তীরে বসে আর্তি নিয়ে সজল নয়নে শ্রীগোবিন্দেরই স্মরণ করেছিলেন এমন সময় সামনে আবির্ভূত হ'ল শ্যামকান্তি দিব্য সুন্দর

এক চপল ব্রজ বালক ঃ হেই, বাবাজী, বসে বসে তুমি নিদ্ যাচ্ছ, না তোমার গোবিন্দের ধেয়ান করছ? তোমার গোবিন্দ ত হোথায় ঐ গোসাটিলার ভেতর রয়েছে।

এই অপরূপ ব্রজ বালকের কথা শুনেই ধ্যানাবেশ কেটে গেল রূপ গোস্বামীর। চমকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি ঃ কি, কি বললে, ভাই তুমি? গোবিন্দজী গোসাটিলায় লুকিয়ে আছেন? কি, গোসা-টিলার কোথায় রয়েছেন তিনি, কে আমাকে তা বলে দেবে?

ভাবনা কিসের, আমি তোমায় তা বাতিয়ে দেব। শোন, রোজ দুপুরে একটা গাই ঐ গোসাটিলার চরতে এসে ঠিক একটা জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার বাঁট থেকে দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। গাইটা যে জায়গাটায় দুধ ঢালে ঠিক তারই নীচে রয়েছে তোমার গোবিন্দজী।

ব্রজবালকের মুখে এই কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।—আমার মনের আর্তি বুঝে কে এই বালক এমন সঞ্জীবনী আশার বাণী শুনালে, একি সত্যিই কোন ব্রজবালক না ছদ্মবেশে স্বয়ং শ্রীগোবিন্দই? ভাবতেই তীব্র রসাবেশে রূপের অন্তর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ভাবাবেগ সহ্য করতে না পেরে তিনি সেখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

চেতনা ফিরে পাবার পর দেখেন সেই প্রিয় দর্শন ব্রজবালক আর সেখানে নেই। রূপ গোস্বামী ব্যস্ত হয়ে ছুটলেন তখনই পাশের গ্রামে। গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন গোসাটিলার ঐ রহস্যের কথা ঃ হ্যাঁ ভাই, গোসাটিলার কোথাও কি রোজ একটা গাভী এসে তার বাঁট থেকে দুধ ঢেলে দিয়ে যায়?

রূপের প্রশ্ন শুনে ব্রজবাসীরা সোৎসাহে বলে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোঁসাই, তুমি ত ঠিকই বলেছ, বেশ কয়েক বৎসর ধরে আমরা দেখে আসছি গোসাটিলার ঠিক একটা জায়গায় একটা গাই এসে রোজ দাঁড়ায় আর তার বাঁট থেকে সেখানে দুধ ঝরে পড়ে। এমন কেন হয়, বাবাজী, বলতে পার? আমাদের মনে হয় ওখানে নিশ্চয়ই কোন দেবতা আছেন।

শুনে রূপ গোস্বামীর দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, ভাবাবেগে সারা দেহ কন্টকিত। গ্রামের লোকদের তিনি মিনতি করে বলেন, এস না ভাই সব, তোমরা আমায় সাহায্য করো, আমার মন বলছে, ঐখানে রয়েছেন আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগোবিন্দদেব।

বাবাজীর কথায় উৎসাহ আর প্রেরণা পেয়ে গ্রামবাসীরা সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে খননের কাজ সুরু করে। ফলে সেই দিনই উদঘাটিত হয় শ্রীগোবিন্দের পবিত্র বিগ্রহ।

রূপ গোস্বামী এবার শাস্ত্রকাব্য উদ্ধৃত করে গ্রামবাসী এবং বৃন্দাবনের সাধু সন্ত এবং ভক্তজনের কাছে প্রমাণ করে দিলেন দ্বাপর যুগে যাকে যোগপীঠ বলা হ'ত এই গোসাটিলাই সেই যোগপীঠ আর এই বিগ্রহই হচ্ছেন রাজা বজ্রনাভের প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত গোবিন্দদেব।

রূপ গোস্বামীর তপস্যায় গোবিন্দদেব তুষ্ট হয়ে নিজেই প্রকটিত হয়েছেন—একথা ব্রজমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে সাধু স্বজ্জন ভক্তেরা এসে সবাই মিলে এক বিরাট ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করেন।

এরপর রূপ সনাতনের সহকর্মী রঘুনাথ ভট্টের এক বিত্তবান শিষ্য গোবিন্দদেবের একটি অতি সুন্দর মন্দির এবং জগমোহন নির্মাণ করিয়ে দেন।

# স্বামী অভেদানন্দ

তিরোধানের পরেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত শিষ্যদের কিভাবে কৃপা করেছেন, রক্ষা করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন স্বামী অভেদানন্দ সুযোগ পেলেই নিজের ভক্তরের তা শোনাতেন। একবার ঠাকুর কি ভাবে তাঁর জীবন রক্ষা করেন তার বিবরণ দিতে তিনি বলেছেন—

লণ্ডন থেকে আমেরিকায় যাব। জাহাজের টিকিট কেনার সব ঠিকঠাক। ইংলণ্ডের বন্দর থেকে যে জাহাজখানা সেবার ছাড়বে নাম তার লুসিটেনিয়া। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে টিকিট কিনতে গেছি জাহাজের এমন সময় অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটল। টিকিট কিনব, কাউণ্টারে যেতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম, উঁহু, কিনো না টিকিট। কার কণ্ঠস্বর ? খুঁজতে এদিক ওদিক তাকালাম। না আশে পাশে নিষেধ করবার মত ত কেউ নেই। ভাবলাম মনের ভুল এ, সুতরাং আবার গেলাম টিকেট কিনতে। এবারও সেই একই কাণ্ড, আরও জোর গলায় নিষেধ। ভ্যাবাচেকা খেয়ে টিকেট না কিনে বাসায় ফিরে এলাম। পরের দিন খবরের কাগজ খুলতেই দেখি বড় বড় অক্ষরে লেখা—S. S. Lusitania is no more—আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে কাল রাত্রে লুসিটেনিয়া ডুবে গেছে।

এই পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে পড়লাম আমি, দুই চোখ জলে ভরে এল, বুঝলাম শ্রীশ্রীঠাকুরই অদৃশ্য থেকে কাল আমায় রক্ষা করেছেন।

° ° •

স্বামী অভেদানন্দ তাঁর অলৌকিক যোগশক্তি বলে কি করে রোগ—বিশেষ করে মানসিক রোগ নিরাময় করতেন তার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সিস্টার শিবাণী। তিনি বলেছেন—আশ্রমের এক ছাত্রের তরুণী বোনের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে উন্মাদ হাসপাতালে

দেওয়া হয়। ঐ বোনটি প্রায়ই আশ্রমে আসত, স্বামীজীর সঙ্গেও তার বেশ জানাশুনা ছিল। হাসপাতালের চিকিৎসায় মেয়েটির রোগ নিরাময় হ'ল না, ডাক্তারেরা স্পষ্টই বলে দিলেন এ রোগ সারবার নয়।

এবার ঐ রোগিনীর দিদি আমাদের আশ্রমের ছাত্রীটি স্মরণ নিল স্বামী অভেদানন্দের। সে অনুনয় করে বললে, আপনি মহাশক্তিধর, আপনার যোগশক্তির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস। কৃপা করে আমার বোনের এ রোগ ভাল করে দিন, তাকে বাঁচান।

অভেদানন্দ যত বলেন তিনি যোগী নন, যোগবলে রোগ আরোগ্য করবার পদ্ধতি তাঁর জানা নেই, ছাত্রীটি কিছুতেই তা শোনে না, সে একেবারে নাছোড়বান্দা, বোনকে তার সারাতেই হবে। তার সঙ্গে কিছুতেই না পেরে স্বামীজী শেষে বললেন, আচ্ছা, তুমি তিন দিন পরে আমার কাছে এসো, দেখি আমি কতটা কি করতে পারি।

ছাত্রীটি তাই করলে, তিন দিন পরে হাজির হ'ল আশ্রমে। স্বামীজী তার সঙ্গে গেলেন সেই উন্মাদাগারে। সেখানে গিয়ে প্রশান্ত মুখে বসলেন তিনি রোগিনীর পাশে, তাবপর পরম স্নেহভরে তার হাতটি ধরে মাঝে মাঝে দুই একটা টোকা দিতে লাগলেন। মুখে কথা তেমন কিছু বললেন না, বেশির ভাগ সময়ই অন্তর্লীণ অবস্থায় রইলেন। কিছুটা সময় অবশ্য মেয়েটির দিকে একান্ত ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার এর কয়েকদিন পরেই যে রোগিনীর রোগ অসাধ্য বলে হাসপাতালের ডাক্তারেরা ঘোষণা করেছিলেন সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, ডাক্তারেরা সানন্দে তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করে দিলেন। বোনের আরোগ্য লাভে উল্লসিত হয়ে তার দিদি কৃতজ্ঞ ছাত্রীটি ছুটে এল স্বামীজীর কাছে কিছু অর্থ ও সোনা প্রণামী দিতে। স্বামীজী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, না, সত্য কখনও বিক্রি করা যায় না, আর তা কেনাও যায় ন। আর তা' ছাড়া আমি কিছুই করিনি, তোমার বোনের রোগ মুক্তির ব্যাপারে যা কিছু করবার করেছেন আমার গুরুদেব।

° ° ° °

সিস্টার শিবানীর লেখায় আর একটি কাহিনীও পাওয়া যায়। এতে তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের তরুণী বান্ধবী অলৌকিক ভাবে কি করে স্বামী অভেদানন্দের কৃপা পেয়েছে তারই বর্ণনা রয়েছে। সিস্টার শিবানী লিখেছেন—মেয়েটি সেদিন তার অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হঠাৎ একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে মুষড়ে পড়ে তারপর আমার বাস কক্ষে ছুটে চলে আসে। আমি তখন ঘরে ছিলাম না। আমার অবর্তমানে সে সেখানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের হাউসকীপারের সতর্কতার ফলে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর আমি ঘরে ফিরে আসি, এবং সারা বিকেল তাকে নিয়ে আমার নানা ঝঞ্ঝাটে কাটে।

মেয়েটি স্বামীজীর কথা আগেই শুনেছিল আমাদের কাছে। সন্ধেবেলায় নিজেই বলে বসল স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে সে তার আশ্রমে যাবে। যথা সময়ে আমরা আশ্রমের হলঘরে গিয়ে হাজির হ'লাম। আশ্চর্য সেদিন বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বামীজী হঠাৎ সুরু করলেন আত্মহত্যা-প্রবণতার কথা। এই প্রবণতা দেহ ও মনের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা বুঝিয়ে দিয়ে যারা এ নিয়ে ভুগছে তাদের শোনালেন তিনি নানা আশা ও আশ্বাসের বাণী।

বক্তৃতা শোনার পর ঐ মানসিকতার তরুণী মেয়েটি বলে উঠল সে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবে। সাক্ষাতের সময় সে স্বামীজীকে ঐ বক্তৃতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার পর নিজের মানসিক দুরবস্থার কথা অকপটে খুলে বললে। আশ্চর্যের কথা এই সাক্ষাৎকারের তিন সপ্তাহের মধ্যে মেয়েটি মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেল, সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন স্বামীজী ঐ মেয়েটির মনের ঐ অবস্থার কথা কি করে জানলেন, আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে কেনই বা আশ্বাসবাণী শোনালেন, তার উত্তরে আমি বলব আধ্যাত্মিক সাধনা বলে তিনি ছিলেন একজন অন্তর্যামী মহাপুরুষ।

# বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

যোগী বিশুদ্ধানন্দের যোগবিভূতির অলৌকিকলীল দেখে যেমন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছেন তাঁর ভক্ত শিষ্য, তিনি নিজেও ঠিক তেমনি হয়েছেন অন্য মহাপুরুষের যোগৈশ্বর্য দেখে— ।

বর্ধমান জেলার বণ্ডুল গ্রামের ছেলে ভোলানাথের বয়স তখন বারোর বেশি নয়। কুকুরে কামড়েছে তাকে, ক্ষেপা কুকুর। ভীষণ জ্বালা সে দংশনের। গ্রামের ডাক্তারের চিকিৎসায় জ্বালার কিছুমাত্র উপশম না হওয়ায় চিকিৎসার জন্য পাঠানো হ'ল তাকে গঙ্গাতীরে চুঁচুড়ায় এক আত্মীয় বাড়িতে। সেখানকার চিকিৎসারও কিছু ফল হচ্ছে না। বিষদুষ্ট ক্ষতের জ্বালা আর সহ্য করতে পারছে না ভোলানাথ। যন্ত্রণায় রাত্রে ঘুমুতেও পারে না সে। এ জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে ভোলানাথ একদিন গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগ করে গঙ্গাতীরে গিয়ে হাজির হল। গঙ্গায় আত্মবিসর্জন দিয়েই সে এ জ্বালা থেকে মুক্ত হবে।

কিন্তু গঙ্গাতীরে গিয়ে দাঁড়াতেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য তার নয়ন-গোচর হ'ল : জটাজুটধারী শিবকল্প এক সন্ন্যাসী স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন আর তাঁর মাথা তুলবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার জল তাকে বেষ্টন করে স্তম্ভাকারে উপরে উঠছে, শুধু একবার নয়, বার-বার, প্রতিবার। দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ভোলানাথ সেই মহাপুরুষের দিকে। স্নান শেষ হ'লে সন্ন্যাসীরও দৃষ্টি পড়ল ভোলানাথের দিকে। এত রাত্রে বালকের এখানে আসার কারণ মহাপুরুষের অজানা থাকবার কথা নয়, প্রথমেই তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে ভোলানাথকে—এ পাপ কাজ করতে নিষেধ করলেন। ভোলনাথ বললে, বাবা, এ রোগের জ্বালা যে আর সহ্য করতে পারছি না।

এ আবার একটা রোগ না কি,—এস, তুমি আমার কাছে একবার

এগিয়ে এস ত বলে সস্নেহে ডাকলেন তিনি ভোলানাথকে। বালক এগিয়ে যেতেই সন্ন্যাসী তার ক্ষত স্থানে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, যাও আর জ্বালা নেই, এবার ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমাও গিয়ে।

ভোলানাথ দেখলো সত্যিই ত সন্ন্যাসী হাত বুলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার আর বিন্দুমাত্র জ্বালা নেই, সর্বাঙ্গে তার এক অপূর্ব শান্তি।

সুস্থ স্বাস্থ্য নিয়ে ভোলানাথ ঘরে ফিরে এল বটে, কিন্তু আসার পর থেকেই তার মনে হ'তে লাগল এমন আসাধারণ শক্তিধর মহাপুরুষ যিনি, তাঁর কাছে থেকে ত—এর চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কিছুও পাওয়া যেতে পারে। মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তি আর কৃপার কথা অহরহ ভোলানাথের মনে পড়তে লাগল। পরদিন আবার গিয়ে সে হাজির হ'ল গঙ্গাতীরে সেইখানে যেখানে আগের দিন সে সন্ন্যাসীর দেখাপেয়েছিল। হ্যাঁ—পেল সে দেখা সেই সন্ন্যাসীর। এদিন আবার একটা অলৌকিক দৃশ্য চোখে পড়ল তার। সন্ন্যাসী গঙ্গার তীরে বসে জপ করছেন, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন গঙ্গার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে থেকে গঙ্গার জল স্ফীত হয়ে উছলে উঠে তাঁর হাত স্পর্শ করে আবার ফিরে যাচ্ছে। অপেক্ষা করে রইল ভোলানাথ। সন্ন্যাসী জপ সেরে উঠলেই ভোলানাথ গিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললে, বাবা, আপনি আমার রোগ সারিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন, এবার আমার জীবনের ভার নেন, আমি আপনার পায়ে শরণ নিলাম। ছাড়ছি নে আমি, দীক্ষা দিয়ে আমার জীবন সার্থক করুন।

বালকের কথা শুনে দিব্যহাসি ফুটে উঠল মহাপুরুষের মুখে। ভোলানাথকে একটা যোগাসন দেখিয়ে দিয়ে একটা মন্ত্র দান করবার পর বললেন, আপাতত তুমি এই আসনে বসে সকাল সন্ধ্যায় এই মন্ত্র জপ করো, যথা সময়ে তোমার অভীষ্ঠ সিদ্ধ হবে।

° ° ° °

বছর দুই পরের কথা। ভোলানাথকে তখন পাঠানো হয়েছে বর্ধমানে—উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়বার জন্যে। একদিন শহরের রাজপথ

দিয়ে যাচ্ছে সে এমন সময় এক মুসলমান ভদ্রলোকের মুখে এক হিন্দু যোগীর অলৌকিক লীলার কথা শুনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ি ঢাকায়। তিনি বলছেন কিছুদিন হ'ল ঢাকায় এক হিন্দু মহাপুরুষ এসেছেন, তিনি রোজ ভোরে বুড়ী গঙ্গায় স্নান করতে যান। স্নান করবার সময় ডুব দিয়ে উঠলেই তাকে ঘিরে এক জলস্তম্ভ উপরে উঠে যায়। এবার সঙ্গে সঙ্গে ভোলানাথের মনে হ'ল—আরে, ইনি ত তা হলে সেই মহাপুরুষ যিনি দু বৎসর আগে আমায় রোগমুক্ত করেছিলেন, এঁকেই ত আমি খুঁজছি।

ভোলানাথ তখনই মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে মহাপুরুষ কোথায় থাকেন, কোথায় তাঁর আস্তানা আর কোন পথেই বা সেখানে যেতে হয় ইত্যাদি সব জেনে নিল।

সন্ন্যাসীর দেখানো আসনে বসে সন্ন্যাসীর দেওয়া মন্ত্র সে এই দুই বৎসর ধরে নিয়মিত জপ করে যাচ্ছিল। এবার আবার যখন তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল তখন সংসার ত্যাগ করে তাঁরই আশ্রয়ে পরম প্রাপ্তির পথে যাত্রা করবে ঠিক করলে সে। কিন্তু এ জন্যে যে মায়ের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। মায়ের অনুমতি মিলল, ভোলানাথের এ সঙ্কল্পে আত্মীয় স্বজন বাধা দিলেও মা বললেন, ওর কোষ্ঠিতে বাইশ বছর বয়সে ওর মৃত্যুযোগ আছে, মহাপুরুষের আশ্রয়ে ধর্মজীবন যাপন করলে ওর সে ফাঁড়া কেটে যাবে, ও দীর্ঘজীবী হয় এইটাই আমার কাম্য।

মায়ের অনুমতি পেয়ে মহোল্লাসে যাত্রা করল ভোলানাথ ঢাকার উদ্দেশ্যে। পথে যেতে আর একটি ছেলের সঙ্গে তার দেখা হ'ল, নাম তার হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোলানাথের মুখে যোগীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তারও প্রবল ইচ্ছা হল সেও সংসার ত্যাগ করে এই মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবে। এরপর দুইজন একসঙ্গে ঢাকার উপকণ্ঠে রসনায় এসে উপস্থিত হ'ল। ঐখানেই মহাপুরুষের ডেরা।

এখনকার রসনা দেখে সে যুগের রসনা কল্পনা করা যায় না। রসনায় তখন কেবল শাল পিয়ালের বন, মাঝে মাঝে তার বড় বড় ঝিল কোথাও কোথাও বা তান্ত্রিক সাধক আর যোগীদের সাধন

পীঠ। ঢাকায় এসে খুঁজে পেতে অনেক কষ্টে পেল দুটি কিশোর মহাপুরুষের দর্শন রসনার বনের একপ্রান্তে। তাকে প্রণাম করে নিজেদের অভিলাষ জানাতে মহাপুরুষ কিন্তু প্রথমে রাজী হন নি, কিন্তু ভোলানাথ এবং হরিপদ দুজনেই নাছোড়বান্দা, তাদের গ্রহণ না করলে তারা তার পা ছাড়বে না।

বাধ্য হয়ে রাজী হতে হ'ল যোগীবরের। সেইদিনই তাদের 'ডেরা ডাণ্ডা' তোলা হ'ল। এরপর রাত্রির ঘন অন্ধকারে সন্ন্যাসী দুই হাতে দুইজনার হাত ধরে নিয়ে চললেন রসনার বনের মধ্য দিয়ে। একটু গিয়েই চোখ বেঁধে দিলেন তিনি দু'জনের। তাদের হল তখন মোহাচ্ছন্ন অবস্থা ; কোন কোন পথে কোন দিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন সন্ন্যাসী, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রইল না। ভোর হলে হল যাত্রা বিরতি। তাঁরা তখন এক মন্দিরের পাশে এক আশ্রমে এসে গেছেন।

ভোলানাথ এবং হরিপদ যখন স্থানীয় লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন এ কোথায় এসেছেন তাঁরা তখন শুনলেন এ বিন্ধ্যাচল। বিন্ধ্যাচল কিন্তু রসনা থেকে ছশো মাইলের মত দূরে। মহাপুরুষ তাদের এক রাত্রির মধ্যে কি করে এত দূর এনে ফেললেন, দুই বন্ধুর কাছে তা অপার রহস্যই রয়ে গেল। যাত্রা কিন্তু তাদের এইখানেই শেষ হ'ল না। মহাপুরুষ এরপর তাদের ঠিক অমনি করেই হিমালয় পার করে তিব্বতের এক মালভূমিতে এনেফেললেন,এখানে কেবল দণ্ডী, সন্ন্যাসী, যোগী আর পরমহংসদের সমাবেশ। বিশুদ্ধানন্দ এই স্থানটার নাম বলতেন জ্ঞানগঞ্জ। যে মহাত্মা এদের দুই বন্ধুকে এখানে এনে হাজির করলেন নাম হচ্ছে তাঁর নীমানন্দ পরমহংস। বিশুদ্ধানন্দজী বলতেন এই সময় তাঁর বয়স পাঁচশো বছর। নীমানন্দ সাধনকামী দুটি ছেলেকে এখান থেকে হিমালয়ের শীর্ষে মনোহর তীর্থ নামক স্থানে তাঁর গুরুদেব মহাতপার কাছে নিয়ে যান। ভোলানাথ এবং হরিপদকে তিনিই দীক্ষা দেন। ভোলানাথের নাম হয় এরপর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী।

o o o

এবার বিশুদ্ধানন্দের নিজের যোগ বিভূতির কথা।

বিশ বৎসর ধরে গুরু মহাতপা এবং শিক্ষাগুরুদেব তত্ত্বাবধানে যোগ

সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর ফিরে এসেছেন বিশুদ্ধানন্দ সমতলে। বর্ধমান শহরের কাছে গুস্করার জমিদার বাড়িতে তাঁর আস্তানা। লোক মুখে তাঁর যোগবিভূতির কথা ছড়িয়ে পড়িয়েছে চারিদিকে। কথাটা রমেশচন্দ্র দত্তেরও কানে গেছে। রমেশচন্দ্র তখন বর্ধমানের ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি নিজে বিশুদ্ধানন্দজীর যোগবিভূতি একবার যাচাই করে দেখবেন বলে গুস্করার জমিদার বাড়িতে খবর পাঠালেন যে তিনি আসছেন— স্বামীজীকে একবার দর্শন করতে।

জমিদার বাড়ির লোকেরা তখনই গিয়ে স্বামীজীকে বললেন, আপনি প্রস্তুত হ'ন, ম্যাজিষ্ট্রেট আসছেন।

স্বামীজী বললেন, তোমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট, তাতে আমার কি? আমার প্রস্তুত হবার কি আছে?

রমেশচন্দ্র আসবার আগে তাঁর স্ত্রীর কাছে কয়েকটা গিনি রেখে এলেন, দেখব স্বামীজী এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন কিনা।

বিশুদ্ধানন্দের সঙ্গে দেখা হলে রমেশচন্দ্রের প্রথম কথা হল, আপনার ত শুনি অনেক যোগবিভূতি লাভ হয়েছে?

তা কিছুটা হয়েছে বই কি, উত্তর দিলেন বিশুদ্ধানন্দজী, তুমি ত দেখছি আমাকে বাজিয়ে দেখতে তোমার গিন্নীর কাছে পাঁচটা গিনি রেখে এসেছ!

উত্তর শুনে রমেশচন্দ্র ত একেবারে 'থ'।

° ° • °

সেকালের বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এসেছেন গুস্করার জমিদার বাড়িতে বিশুদ্ধানন্দজীকে দর্শন করতে। কথা প্রসঙ্গে বিশুদ্ধানন্দজী ডাক্তার সরকারকে বললেন, তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে দেহের কয়েকটি বিশিষ্ট দ্বারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ কয়েকটি ছাড়া অগণিত দ্বার রয়েছে এই মানবদেহে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের প্রতি লোমকূপই এক একটি দ্বার। প্রমাণ দেখাতে পরপর অনেকগুলি স্ফটিকের দানা প্রবেশ করিয়ে দিলেন নিজদেহে, তারপর নিজের আঙুল দিয়ে টেনে টেনে বের করলেন সেগুলি।

এ ছাড়া আর একটা মহাবিস্ময়কর ক্রিয়া দেখালেন তিনি: একটা

ঘৃতসিক্ত কাপড়ের কানি তিনি নিজের মুখ বিবর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাভিমূল দিয়ে টেনে বের করলেন। বের করবার সময় ডাক্তার সরকারও তাতে হাত লাগিয়েছিলেন।

• ০ ০ ০ ০

রায় বাহাদুর গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুলিশের এক উচ্চপদের কর্মচারী। আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে আগ্রহ জেগেছে তাঁর। স্বপ্নে একটা মন্ত্রলাভ হয়েছে তাঁর, তা ছাড়া স্বপ্নেই তিনি এক দেবমূর্তিও প্রস্তুত করিয়েছেন। এ পর্যন্ত গুরুকরণ তাঁর হয়নি। তিনি স্থির করেছেন—যিনি তাঁর স্বপ্নে লব্ধ মন্ত্রের মর্মোৎঘাটন করতে পারবেন তাঁকেই তিনি গুরুপদে বরণ করবেন।

এ পর্যন্ত অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি মিলিত হয়েছেন, কেউই তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন নি। অবশেষে এলেন তিনি বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে। তাঁকে দেখেই বিশুদ্ধানন্দজী বলে উঠলেন, তুমি ত স্বপ্নেই একটা মন্ত্র পেয়ে গেছ!

গিরীন্দ্রবাবু নিরুত্তর রহিলেন। স্বামীজী তখন বললেন, স্বপ্নে একটা দেবমূর্তি দেখে তুমি তদনুরূপ একটা ধাতুমূর্তি তৈরি করিয়েছ। গিরীন্দ্রবাবু তখনও নিরুত্তর। এরপর বিশুদ্ধানন্দজী হেসে গিরীন্দ্র-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে একটা বাক্সের মাঝ থেকে নিজ হাতে সেই দেব-মূর্তিটি বের করলেন। বলা বাহুল্য বিশুদ্ধানন্দজীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এবার আর কোন সংশয় রইল না, তিনি তখনই স্বামীজীর চরণে প্রণাম করে তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন।

• ০ ০ ০ ০

একবার বিশুদ্ধানন্দজী এসেছেন শান্তিপুরে শিষ্য গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। এই সময় এক সন্ন্যাসী এলেন সেখানে। তাঁর কাছে এক অদ্ভুত শিবলিঙ্গ রয়েছে। এই শিবলিঙ্গের দিকে কেউ বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। সন্ন্যাসী ঐ শিবলিঙ্গের সাহায্যে সাধুসন্তের গুণাগুণ পরীক্ষা করে বেড়ান। সন্ন্যাসীকে দেখেই স্বামীজী তাঁর অন্তরের কথা বুঝে ফেললেন। ভাবলেন—একে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার। বললেন, বের করো তোমার শিবলিঙ্গ।

সন্ন্যাসী শিবলিঙ্গটি বের করে স্বামীজীর সামনে ধরলে স্বামীজী ওটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিজের সামনে রেখে কিছুক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে বিগ্রহটি খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। দেখে একেবারে মুষড়ে পড়লেন সন্ন্যাসী, চোখে তাঁর অশ্রু দেখা দিল।

তা দেখে বিশুদ্ধানন্দজী বললেন, এতে তোমার চোখে জল এসে গেল কেন? এটা ভেঙে ফেল, আর একটা যোগাড় করে নিলেই ত চলবে।

সন্ন্যাসী বললেন, না, বাবা, তা হয় না! এ শিবলিঙ্গটি আমার নয় অপরের। এর এই বিশিষ্ট গুণ থাকায় তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমি কাজে লাগাচ্ছিলাম, এমনটি আর পাব কোথা?

সন্ন্যাসীর কথা শুনে স্বামীজী শিবলিঙ্গের খণ্ডগুলি নিজের হাতে তুলে নিলেন, তারপর হাত বন্ধ করে উপরে তুলে কয়েকবার ঘুরালেন, তারপর হাত নীচে নামিয়ে যখন খুললেন তখন দেখা গেল—শিবলিঙ্গটি আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনটি হয়ে গেছে, ভাঙাচোরার দাগ পর্যন্ত কোথাও নেই। লিঙ্গটি এবার সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিয়ে স্বামীজী বললেন, দেখলে ত, যে ভাঙতে পারে সে আবার গড়তেও পারে। যাও এমন কাজ আর করে বেড়িও না, সাধুসন্তদের শক্তি যাচাই করতে যেও না।

• ◦ ◦ ◦

একবার ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী আর অক্ষয়কুমার দত্ত এসেছেন বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে। তাঁরা লোক মুখে শুনেছেন স্বামীজী পরমাণু থেকে হীরে, প্রবাল ইত্যাদি তৈরী করতে পারেন। তাঁরা স্বামীজীকে ঐ রকম কিছু করে দেখাতে অনুরোধ করলে তিনি একটা লেনস্ হাতে নিয়ে তার উপর সূর্যালোক প্রতিফলিত করে একটা প্রবাল সৃষ্টি করলেন। অক্ষয় কুমারের সন্দিগ্ধ মন, তাঁর মনে হ'ল এর মাঝে হাতের কৌশল আছে। এই সন্দেহেই তিনি স্বামীজীর হাত ধরে ফেললেন। স্বামীজী এতে তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করতে পারেন নি, অক্ষয় কুমারের গণ্ডে এক চপেটাঘাত করে তিনি নিজের হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, দেখ, ভালো করে দেখ—আমি কোথায় কি লুকিয়ে রেখেছি।

এরপর স্বামীজী যে কম্বলের আসনের উপর বসে ছিলেন তা থেকে কিছুটা পশম ছিড়ে নিয়ে নিজের হাতের মুঠোর মাঝে নিয়ে কেবল নিজের ইচ্ছাশক্তি বা যোগবলে ঐ পশমকেই একটা উজ্জল প্রবালে পরিণত করে দেখালেন।

দত্ত মশায়ের সন্দেহ তবুও যেতে চায় না। স্বামীজী তখন তাঁর নাভিপ্রদেশ স্ফীত ও বিস্ফারিত করে তুলে তার মাঝে পাশ বালিশের একাংশ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে অক্ষয়কুমার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

° ° ° °

কাশীতে থাকবার সময় তাঁর এক নাম ছিল গন্ধবাবা। এর কারণ ছিল, তাঁর দেহ থেকে প্রায়ই পদ্মগন্ধ নির্গত হত, তা ছাড়া যার প্রতি তিনি প্রসন্ন হ'তেন তাকে কাছে ডেকে এনে তার জামা কাপড় বা রুমাল কেবলমাত্র স্পর্শের দ্বারা সুবভিত করে দিতেন।

° ° ° °

ডক্টর সুরেন দাশগুপ্ত তাঁর ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মেয়েটির মন বড় সরল দেখে স্বামীজী তাকে সস্নেহে কাছে ডেকে বললেন, দাঁড়া, তোকে একটা ভাল জিনিস খাওয়াচ্ছি। এই বলে তিনি একটা খালি কৌটো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন, একটু পরে সেটা খুললে দেখা গেল তার মাঝে এক গাদা সুস্বাদু সন্দেশ। মেয়েটি পরম তৃপ্তির সঙ্গে তা খেল।

এ রকম তিনি প্রায়ই করতেন : খালি বাকসো বা কৌটো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেবার পর তা থেকে তিনি নানা সুখাদ্য বের করতেন, কখনও বা তিনি কাগজকে ফুলে পরিণত করতেন।

এইসব যোগ বিভূতি তিনি কেন দেখান প্রশ্ন জাগতে পারে কারো মনে তাই তিনি বলতেন এর সুফল হচ্ছে এই যে এতে লোকের মন আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের দিকে আকৃষ্ট হয়।

° ° ° °

অনেক দূর থেকেও তিনি তাঁর শিষ্যদের গতিবিধি মনোভাব সব জানতে পারতেন। একবার এক শিষ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেই

তিনি রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, বাপু হে, আসনে বসে কি মেয়েমানুষের মুখ ভাবতে হয় ?

শিষ্যটি শুনে হকচকিয়ে গিয়ে উত্তর দিলে বাবা, এ রকমটি আর হবে না।

কি ব্যাপার কি, গুরুজী এমন বকলেন কেন তোমায়, তাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে তার গুরু ভাইয়েরা।

শিষ্যটি উত্তরে বললে, কা'ল তদন্তে বেরিয়ে পথে আমি এক সুন্দরী তরুণীকে দেখি। বাড়ি এসে আসনে বসে ধ্যান করতে গেলে তার কাথাই আমার কেবল মনে হচ্ছিল। গুরুজী অন্তর্যামী, দূর থেকেই তা জেনে ফেলেছেন।

০ ০ ০ ০

এক স্খলিত-চরিত্র যুবক বিশুদ্ধানন্দজীর কৃপা লাভ করেছিল, স্বামিজী দীক্ষা দিয়েছিলেন তাকে। অতঃপর যুবক বিবাহ করেছিল, বিবাহের পর সে সংযত জীবন যাপন করবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু হ'লে হবে কি, আগে যে ভ্রষ্টা নারীর সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় ছিল, সে তাকে ছাড়তে চায় না, নানা কৌশলে সাক্ষাৎকারের সুযোগ করে তার কাছে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

একদিন মধ্যরাত্রে স্ত্রী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন লোকটি সেই ভ্রষ্টা নারীর কাছে যাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে উঠল, ভাবলে যাই—একবার মেয়েটিকে ভাল করে বুঝিয়ে বলে আসি আমাদের পূর্ব প্রণয়ে ক্ষান্ত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। এই ভেবে মেয়েটির কাছে যাবার জন্য দরজা খুলেছে, অমনি তার স্ত্রী যাকে সে গভীর নিদ্রামগ্ন দেখে এসেছিল সে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেললে : আবার তুমি সেই মেয়েটির কাছে যাচ্ছো ?

যুবক অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি জানলে কি করে ? তোমাকে ত দেখে এলাম আমি—অবরঘুম ঘুমাচ্ছ।

উত্তরে স্ত্রী যা বললে, তা শুনে যুবকের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। স্ত্রী বললে, হ্যাঁ আমি বেহুঁশ হয়েই ঘুমাচ্ছিলাম। কিন্তু গুরু বিশুদ্ধানন্দজী এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললেন, ওরে, ওঠ, ওঠ,—তুই ত

একেবারে মরার মত ঘুমুচ্ছিস, তোর স্বামী যে এ দিকে আবার সেই মেয়েটির কাছে যাচ্ছে!

বলে রাখা দরকার বিশুদ্ধানন্দজী তখন তার এই শিষ্যের কাছ থেকে শতশত মাইল দূরে। দূরে থাকলেও তাঁর যোগশক্তি বলে তিনি তাঁর প্রতি শিষ্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে তাদের কল্যাণ সাধন করতেন।

° ° ° °

বিশুদ্ধানন্দজী তখন কলকাতায়। নেপালের এক রাণা অনেক চেষ্টায় তাঁর সন্ধান পেয়ে নিজের কিশোরী কন্যাকে নিয়ে তাঁর সামনে এসে হাজির। রাণা স্বামীজীকে প্রণাম করার পর তাঁর ব্যাগ থেকে এক সন্ন্যাসীর ছবি দেখালেন স্বামীজীকে। স্বামীজী তা দেখেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে আমার,—কি চাও তুমি আমার কাছে বলো।

রাণা কাতর কণ্ঠে বললেন, বাবা, আমি আমার মেয়েটিকে সঙ্গে এনেছি, বড় আদরের মেয়ে এ আমার। কিন্তু বহুদিন যাবৎ এ দুরারোগ্য—মস্তিষ্কের ব্যাধিতে ভুগেছে, চিকিৎসার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, অনেক অর্থ ব্যয় করেছি,—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আপনি কৃপা করে একে সারিয়ে দিন বাবা, নইলে জীবনটা এর একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

স্বামীজী ধীর চিত্তে শুনে মেয়েটিকে কাছে ডাকলেন তারপর তার মাথায় কিছুক্ষণ হাত রেখে বললেন, যা তোর অসুখ সেরে গেল, এ অসুখ আর কোন দিন হবে না।

রাণা তাঁর মেয়েকে নিয়ে চলে গেলে স্বামীজী তাঁর কৌতূহলী শিষ্যদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, বহু বৎসর পূর্বে যখন আমি পরিব্রাজক হয়ে ঘুরছিলাম, তখন ঘুরতে ঘুরতে আমি একবার নেপালের এক গভীর অরণ্যে এক গাছের নীচে আসন পাতি। নেপালের এক রাণা তাঁর অনুচরদের নিয়ে ওখান দিয়ে যেতে আমাকে দেখে আমর কাছে এসে প্রণাম করে জোড়হাতে বলেন, বাবা, আমি আপনার জন্য কিছু করতে চাই, কি করলে আপনার একটু উপকার হয়, জানলে ধন্য হব।

কিছু না করে কিছুতেই ছাড়তে চা'ন না তিনি। আমি তখন বলি, বেশ তা হ'লে তুমি আমার ধুনীর জন্যে কিছু কাঠের ব্যবস্থা করে দাও। রাণা তখন তাঁর লোকদের দিয়ে অনেক কাঠ আনিয়ে জমা করেন আমার আসনের পাশে। যা'ক—এতদিনে আমার সে ঋণ শোধ হয়ে গেল, বলে স্বামীজী একটু হাসলেন।

# শৈবাচার্য অপ্পর

বর্তমান তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার ক্ষুদ্র এক গ্রামে জন্ম। বংশে তাঁদের শিবসাধনার ধারাটিই দীর্ঘকাল হয়ে এসেছে, তবু ভাগ্যচক্রে পড়ে প্রথম জীবনে তিনি জৈন ধর্মে দীক্ষিত হ'ন।

শৈশবেই অতি অল্প দিনের ব্যবধানে অপ্পর, তাঁর বাপ মা দুই-জনকেই হারান, বালবিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাঁর বাপ-মার সংসারেই বাস করতেন, এর পর তিনি অপ্পরের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন।

বিদ্যাশিক্ষার জন্য যথা সময়ে অপ্পরকে গ্রামের পাঠশালায় দেওয়া হয়; সেখানে তাঁর অসাধারণ মেধা এবং প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিত্যকার পাঠ শেষ হলেই বালক অপ্পর দিদির কোল ঘেষে বসে তাঁর মুখে শোনেন প্রাচীন পুরাণের নানা মনোজ্ঞ উপাখ্যান, সাধুসন্ত-দের জীবনের অলৌকিক কাহিনী।

দিদি অনেক আগেই ভক্তিসিদ্ধ শৈবগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, সাংসারিক কাজ কর্ম আর অপ্পরের দেখাশুনার সময় ছাড়া বাকী যে সময়টুকু পান তা কাটে তাঁর শিবের আরাধনা আর জপধ্যানে। সর্ব-শেষে শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে বসে আবৃত্তি করেন শিবস্তোত্রমালা। মন্দির চত্বরে ক্রীড়ারত অপ্পর শিব প্রশস্তির সে দিব্যগম্ভীর ধ্বনিতে উচ্চকিত হয়ে পূজা বেদীর কাছে ছুটে এসে নির্ণিমেষে চেয়ে থাকে দিদির ভাব প্রদীপ্ত মুখের দিকে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাঠ শেষ হয়ে যায়, এবার উচ্চতর পাঠের জন্য যেতে হবে তাঁকে কোন উচ্চতর শাস্ত্রপাঠের কেন্দ্রে। সারা দক্ষিণ দেশে তখন পল্লবরাজ মহেন্দ্রের রাজধানী কাঞ্চীর বহুল খ্যাতি। তখন এ নগরী সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কেন্দ্র।

রাজা মহেন্দ্র ধর্মের দিক দিয়ে জৈন মতাবলম্বী। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠ-পোশকতায় উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ জৈন পণ্ডিতেরা কাঞ্চীতে এসে মিলিত হয়েছেন। জৈন শাস্ত্রবিদ এবং তর্কশূরদের এক মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে এখানে। রাজ সভায় প্রায়ই শাস্ত্রবিচার ও তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সব সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরাই নিজ নিজ মতবাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হ'ন।

পাঠশালায় পড়বার সময়ই কাঞ্চী নগরের বিদ্যাবৈভবের কথা কানে গিয়েছে অপ্পরের। বিদ্যোৎসাহী সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছে মনে। তাই বেশ কিছুদিন যাবৎ তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র কাঞ্চীতে যাবার জন্য।

একদিন তাই সুযোগ মত তিনি তাঁর দিদিকে বললেন, দিদি, উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমি কাঞ্চীতে যেতে চাই, সেই ব্যবস্থাই তুমি আমার করে দাও।

দিদি বললেন ওরে তুই কৃতী হয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিস এই ত আমি চাই, কিন্তু উচ্চশিক্ষার জন্য তুই কাঞ্চীর বিদ্যাপীঠে যাস—এটা ভাই আমার পছন্দ নয়।

কেন বলো ত ?

শুনেছি কাঞ্চীতে জৈন রাজা মহেন্দ্রের সম্প্রদায় জৈনদেরই বেশি প্রতিপত্তি। ওখানকার পণ্ডিতদের ন্যায়-শাস্ত্রের কূট তর্ক নিয়েই কচকচি। ঈশ্বর তত্ত্বের তারা তেমন আমল দেন না। আমাদের ইষ্টদেব শিব সেখানে অজ্ঞাত।

উত্তরে অপ্পর বলেন, এ কি তুমি বলছ দিদি, আমি নিজে যদি ঠিক থাকি, আমার নিজের ধ্যানধারণা যদি অটুট থাকে তবে কে আমার কি করবে ? তা ছাড়া প্রকৃত শাস্ত্রবিদ হতে হ'লে সকল সম্প্রদায়ের শাস্ত্রই ত পড়া আবশ্যক। কাঞ্চী ছাড়া এ সুবিধা ত আর কোথাও হতে পারে না।

দিদি বলেন, আমি বলি কি তুই বরং চিদাম্বরমে চলে যা সেখানে রয়েছেন দিকপাল কত পণ্ডিত তা ছাড়া কত সিদ্ধ শৈব মহাত্মা।

কিন্তু সেখানে গিয়ে ত শুধু একটি মাত্র সম্প্রদায়ের একমাত্র চিন্তা-ধারার সঙ্গেই আমার পরিচয় হবে। মনের দশ-দিকের দশটি জানালা ত খুলবে না, শাস্ত্রের বহুমুখী তত্ত্ব ত আমি আয়ত্ত করতে পারব না। না, না, দিদি তুমি বাধা দিও না, আমি কাঞ্চীতেই যাব।

এরপর দিদি আর বাধা দিলেন না, কাঞ্চীতেই এলেন অপ্পর। এখানকার বিদ্যাপীঠে জৈন অধ্যাপকদেরই প্রাধান্য। তাঁদের নেতৃত্ব এবং তত্ত্বাবধানেই চলছে বিদ্যার্থীদের শাস্ত্র অধ্যয়ন। প্রতিভা-বীর তরুণ অপ্পর কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে উঠলেন, বিশেষ করে জৈন শাস্ত্রে। প্রবীণ জৈন ধর্মনেতা এবং সাধকেরা তাঁর মধ্যে এক বিরাট প্রতিশ্রুতি লক্ষ করলেন। এ ছাড়া তার মাঝে ছিল এক অসমান্য কবি প্রতিভা। ফলে অচিরে রাজা মহেন্দ্রের প্রসন্ন দৃষ্টিও তাঁও উপর পতিত হ'ল। অবশেষে একদিন রাজগুরুর কাজেই জৈনধর্মে দীক্ষা নিয়ে বসলেন অপ্পর। রাজ সভার পণ্ডিতেরা বুঝে নিলেন এই তরুণ পণ্ডিতই একদিন এ রাজ্যের জৈন ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

মাঝে মাঝে অপ্‌পর কাঞ্চী থেকে নিজের গ্রামে ফিরে এসে দিদির সান্নিধ্যে কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে যায়। তার মাঝে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে দিদির স্নেহ দৃষ্টিতে তা এড়ায় না। তিনি লক্ষ্য করেন ভাইয়ের মনে জেগেছে বিদ্যার অভিমান, জৈন পণ্ডিতের সংস্পর্শে আস্তিক্যবুদ্ধিও প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

একদিন তাই মনের ক্ষোভ আর চেপে রাখতে না পেরে তিনি ভাইকে বলে উঠলেন, কাঞ্চীতে গিয়ে খুবই উন্নতি হয়েছে তোমার— দেখছি। দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়েছ। কিন্তু যে পণ্ডিত্য ভগবৎ দর্শনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার এক কানাকড়িও মূল্য নেই, তা জানিস?

অপ্‌পর শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠলে কেন বলো ত?

আমি বেশ লক্ষ্য করছি তোর মাঝে বিদ্যার অভিমান দানা বেঁধেছে। বেশ বুঝছি জৈন নৈয়ায়িকদের পাল্লায় পড়ে তুই জৈনমতাবলম্বী হয়ে গেছিস। আমাদের পিতৃবংশ শৈব, পিতৃপুরুষেরা ছিলেন সব উচ্চ-

কোটির শৈব সাধক। তাঁদের পথ থেকে দূরে সরে গেলি তুই। এর ফল কখনও ভাল হয়, শুভ হয়?

এরই কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন মারাত্মক শূলব্যথায় একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন অপ্পর। বিচক্ষণ চিকিৎসকদের ডাকা হ'ল, তাঁরা চেষ্টাও অনেক করলেন,—কিন্তু রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অবস্থা শেষে এমন চরমে উঠল যে অপ্পরকে বুঝি আর বাঁচানো যায় না।

হঠাৎ সেই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে দিদির গুরুদেব বাড়িতে এসে হাজির। সিদ্ধ শিব সাধক তিনি, যোগবিভূতির খ্যাতিও তাঁর যথেষ্ট। তাই তাঁর আগমনে সবাই মনে বল পেলেন। জানানো হ'ল তাঁকে রোগীর সংকটাপন্ন অবস্থার কথা।

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু বললেন, অস্থির হয়ো না তোমরা, এ সংকট কেটে যাবে, অপ্‌পর সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠবে। কিন্তু এর জন্য দেবাদি-দেব শিবের শরণাপন্ন হতে হবে তার, প্রাণ ভিক্ষা চাইতে হবে আশুতোষের কাছে। বংশানুক্রমে আশুতোষ শিবই হচ্ছেন তোমাদের ইষ্টদেব। তাঁর প্রতি বিমুখ হওয়াতেই অপ্‌পরের বিপত্তি। তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই রয়েছেন জাগ্রত শিববিগ্রহ। অপ্‌পর আজই গিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করুক। আশীর্বাদ করছি আমি—রক্ষা পাবে সে, কোন ভয় নেই।

এই বলে মহাপুরুষ বিদায় নিলেন। গুরুদেবের কথা দিদির কাছে বেদবাক্য, বুঝলেন তিনি প্রভু শিবের কৃপায় ভাইয়ের জীবন রক্ষা পাবে।

এবার তিনি অপ্‌পরকে নিয়ে পড়লেন,—শোন্‌ শুধু অন্তঃসার-শূণ্য গ্রন্থকীট হয়েই তুই তোর ইষ্টদেবকে ভুলেছিস। তাই ত তোর এই দুর্ভোগ। আমরা সবাই তোকে ধরাধরি করে শিবমন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে গিয়ে তুই শিবজীর চরণে স্তবস্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন কর, দেখবি অচিরে তোর দেহের রোগ ভবরোগ—সব কিছু দূর হয়ে যাবে। গুরু মহারাজ বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁর কথা অন্যথা হবার নয়।

প্রচণ্ড শূলবেদনায় তখন অপ্পরের প্রাণ যায় যায় অবস্থা, দৈব-কৃপার উপর নির্ভর করতে তাই তাঁর আর কোন আপত্তি রইল না।

নিস্তব্ধ রাত্রি, চারিদিকে ঘন অন্ধকার, ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় শিবমন্দিরের অভ্যন্তরে বেদনার্ত অপ্পর শায়িত, অস্ফুট ক্ষীণস্বরে জপছেন শুধু শিবজীর নাম। বেশ কিছুক্ষণ এক মনে জপার পরই দেখেন হঠাৎ কি এক দিব্য জ্যোতিতে মন্দিরের গর্ভকক্ষটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দৈবকণ্ঠের অভয়বাণী: বৎস অপ্পর, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে এক নবজন্ম লাভ করলে তুমি। আশীর্বাদ করি নতুন করে ঈশ্বর চেতনা জাগ্রত হ'ক তোমার হৃদয়ে, আর সে চেতনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক মানুষের কল্যাণে।

এ কি অত্যদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! কোথায় গেল তাঁর সেই দুঃসহ শূলবেদনা! দৈব কণ্ঠ শোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন এক নবজীবন লাভ করলেন তিনি। লাভ করলেন—এক নতুন চেতনা। দুঃস্বপ্নেভরা রাত্রির অবসানে এ যেন এক আলোকময় নব-জাগরণ।

দিব্য আনন্দের আবেগে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, পরক্ষণেই ভাবাবেশে বিগ্রহের বেদীতলে লুটিয়ে পড়ে যুক্ত করে নিবেদন করলেন শিবমহিমার অপরূপ স্তবগাথা।

অপ্পরের আবার কানে এল সেই দিব্যপুরুষের বাণী,—বৎস অপ্পর, তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি আমি, আজ থেকে এ অঞ্চলের শিব-ভক্তদের কাছে তুমি হবে 'তিরুণাবক্‌রস্থু'—দেবতার আশিস্‌পূত বাচস্পতি।

০ ০ ০

দেবাদিদেবের কৃপাপ্রাপ্তির পর দিদির নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কুলগুরু শৈবাচার্যের কাছ থেকে শিবমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন অপ্পর। সুরু হ'ল কঠোর সাধনা। প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে সাধনসত্তা মিলিত হওয়ায় লাভ করলেন অপ্পর অসাধারণ শিবভক্তি ও দিব্য অনুভূতি। ভাবাবিষ্ট অপ্পরের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হতে থাকে ইষ্টের মাহাত্ম্যসূচক স্তব-গাথা। এ ছাড়া দীনবেশে শিবমন্দিরের জংজাল অপসারণ তার

নিত্য কর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

দৈন্যময় ত্যাগব্রতী মহাপ্রতিভাধর এই মহাসাধকের চরণতলে দিনের পর দিন শত শত নরনারী ভিড় করতে থাকে। গৃহপ্রাঙ্গণ শিবভক্তদের উচ্চারিত শিবস্তোত্রে মুখর হয়ে ওঠে। কাঞ্চী, মাদুরা, চিদম্বরম্ প্রভৃতি নগরেও অপ্পরের শিবভক্তির খ্যাতি অচিরে ছড়িয়ে পড়ে।

কাঞ্চীর জৈন সাধক এবং পণ্ডিতেরা অপ্পরের এই ধর্মমত পরিবর্তনে নিরতিশয় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তারা আশা করেছিলেন প্রতিভাধর তরুণ অপ্পর জৈন ধর্মেরই প্রসার এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবেন, তা না করে তিনি কি না শৈবধর্মের নব অভ্যুদয় ঘটাতে বসেছেন।

ক্ষুব্ধ রুষ্ট রাজপণ্ডিতেরা এবার পাণ্ড্যরাজ মহেন্দ্রের কাছে গিয়ে অভিযোগ তুললেন, মহারাজ, অপ্পর জৈনমণ্ডলীর সংস্রব ত্যাগ করে, জৈনধর্ম ত্যাগ করে শৈব ধর্ম প্রচার করে বেড়াচ্ছে। অকৃতজ্ঞ যে সরকারী বিদ্যাপাঠে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে যে উপকার সে পেয়েছে তা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। অবিলম্বে তার দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা না করলে রাজকীয় ধর্ম শোচনীয় পরিণতি লাভ করবে।

রাজ পণ্ডিতদের এই কথা শুনে রাজা ক্রোধে অগ্নি শর্মা হয়ে তখনই জৈন ধর্ম ত্যাগী অপ্পরের সমুচিত দণ্ড বিধানের জন্য তাকে রাজ সভায় উপস্থিত করতে হুকুম দিলেন।

অপ্পরকে রাজ সভায় হাজির করা হ'লে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত রাজ পণ্ডিতদের অভিযোগের উত্তরে তিনি ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, মহারাজ, সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ— কোন পন্থারই শাস্ত্র ও সাধনতত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ করতে কার্পণ্য করি নি। এই করতে গিয়েই জৈন মত আমি গ্রহণ করেছিলাম এ কথা ঠিক। কিন্তু এর পরে প্রভু শিবজীর অপার করুণা আমি মর্মে উপলব্ধি করেছি, তার ফলে জীবনে আমার কোন অপরাধ হয়েছে বলে আমি ভাবতে পারি না।

শুনে রাজা ক্রোধে গর্জে উঠলেন, জানো না জৈন ধর্ম এখানকার

রাজধর্ম। সেই ধর্ম একবার গ্রহণ করে তুমি ত্যাগ করেছ, ঐ জন্য কঠোর শাস্তি তোমার প্রাপ্য। ভুলে যাচ্ছ তোমার রাজকীয় বিদ্যাপীঠে অধ্যয়নে তোমার জন্য রাজকোষের বহু অর্থ এবং রাজপণ্ডিতদের বহু শ্রম ব্যয়িত হয়েছে। ঠিক কি না?

অপ্‌র উত্তরে বলেন, মহারাজ যা বললেন তা সর্বৈ সত্য, কিন্তু কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার বিচারে আমি কোন অধর্মাচরণ করেছি বলে মনে করতে পারছি না, কারণ ধর্মের মূল লক্ষ্য হ'ল পরম সত্য আবিষ্কার, এবং আবিষ্কারের পর সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকা। শৈবধর্মের ছায়াবলে পরম প্রভু শিবের আশ্রয়ে এসে আমি সেই সত্যকেই লাভ করেছি। জীবন আমার আজ ধন্য।

ক্রোধোদ্দীপ্ত কণ্ঠে রাজা বলে উঠলেন, তুমি কি বলতে চাও জৈন-ধর্মে কোন সত্য বস্তু নেই, যা কিছু সত্য বস্তু তা ঐ শৈবধর্মে?

এই সুযোগে রাজ-পণ্ডিতেরা সোরগোল তুলে বলে উঠলেন, মহারাজ, রাজ-ধর্মের অবমাননার জন্য চরম দণ্ড এ দুর্বৃত্তের প্রাপ্য। একে এ না দিলে রাজধর্ম একেবারে রসাতলে যাবে। রাজ্যের হবে মহা অকল্যাণ।

রাজা এবার উচ্চ কণ্ঠে অপ্‌পরকে বলে উঠলেন। আচার্য অপ্‌পর তুমি একবার রাজধর্ম গ্রহণ করবার পর তা পরিত্যাগ করে যে গুরুতর অপরাধ করেছ সবার বিচারে তার একমাত্র দণ্ড হচ্ছে প্রাণদণ্ড, সেই চরম দণ্ডের আদেশই আমি দিচ্ছি।

রাজাদেশে ঘাতক অপ্‌পরকে নিয়ে গেল এক সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায়। রাজার নির্দেশ ঐ চূড়া থেকে অপ্‌পরকে নীচে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে। ঘাতক রাজাদেশ যথাসাধ্য পালন করল বটে, কিন্তু আশ্চর্য—সাধক অপ্‌পরের তাতে মৃত্যু হ'ল না। শেষে দেখা গেল পর্বতশীর্ষ থেকে অপ্‌পরে দেহটি নিক্ষিপ্ত হ'লেও পড়েছে এসে তা একটা ঘন আগাছার ঝোপে।

প্রাণ-দণ্ড দেখতে যে সব লোক সেখানে উপস্থিত ছিল তারা সব অপ্‌পরের জয়ধ্বনি দিতে লাগল। অনেকে বলতে লাগল—শিবের একান্ত ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ এই অপ্‌পর। তাই প্রভু—শিবই রক্ষা

করেছেন ওঁর জীবন।

রাজপুরুষেরা ছুটে গিয়ে রাজার কাছে এই অঘটনার কথা বলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—অপ্‌পরকে কি আবার পাহাড়ের চূড়া থেকে নিক্ষেপ করা হবে?

না, হাজার-হাজার লোকের সামনে এ ভাবে ওর প্রাণ নাশের চেষ্টা সমীচীন হবে না। তোমরা বরং অপ্‌পরকে গভীর সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ওর গলায় ভারী পাথর বেধে ডুবিয়ে দিয়ে এসো।

রাজার আদেশে তাঁর কর্মচারীরা তাই করে কাঞ্চীতে ফিরে এল। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল এক মহাবিস্ময়কর দৃশ্য: সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েও অপ্‌পরের প্রাণ-নাশ হয় নি, ইষ্টদেব শিবের কৃপায় ভারী পাথরখানা কি করে তাঁর গলা থেকে খসে যাওয়ায় তরঙ্গের আঘাতে তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ তীরে এসে লেগেছে। পাশেই যে সব জেলে মাছ ধরছিল তারা তাঁকে এই অবস্থায় পেয়ে সেবা করে তাঁর চৈতন্য ফিরিয়ে আনে।

সুস্থ হয়ে উঠবার পর অপ্‌পর জেলেদের কাছে সব ব্যাপার খুলে বলেন। এরপর চলতে থাকেন রাজপ্রাসাদের দিকে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর পিছনে তখন এক বিরাট জনতা। তাদের সবারই বিশ্বাস এই মহাসাধক দেবাদিদেবের অনুগৃহীত, তাই তাঁরই কৃপায় দুই দুইবার মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসতে পারলেন। তাদের কয়েকজন তখন মুখপাত্র হয়ে রাজার কাছে গিয়ে বললে, মহারাজ, আমরা স্পষ্ট বুঝেছি অপ্‌পর শিবের কৃপাতেই এই দ্বিতীয়বার বেঁচে গেছেন। ইনি সিদ্ধপুরুষ, এ যুগের প্রহ্লাদ। আপনি এবার এঁকে মুক্তি দিন এই আমাদের প্রার্থনা।

দুই দুইবার এমন অলৌকিক ভাবে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ায় রাজার অন্তরে এর মাঝেই আলোড়ন সুরু হয়ে গেছে। অপ্পরকে তাঁর সামনে হাজির করা হলে তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, অপ্পর, বুঝেছি এই দু দুবার তোমার প্রাণ রক্ষা পেল কোন বিরাট শক্তির সাহায্যে, আচ্ছা খোলসা করে আমায় বলো ত—প্রকৃত ব্যাপারটা কি?

প্রশ্ন শুনেই উদ্ধারকর্তা শিবের কথা মনে পড়তেই আবেগে চোখ দুটি অপ্‌পরের আপনি বুজে এল, মুখে বিভাসিত হ'ল দিব্যজ্যোতির আভা, গণ্ড বেয়ে ঝরতে লাগল ফোঁটা ফোঁটা পুলকাশ্রু। যুক্ত করে গেয়ে উঠলেন স্বরচিত শিবের একটি স্তবগাথা—

আমার প্রভু দেবাদিদেবের গলে দোলে—
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মালা,
সৃষ্টি আর প্রলয়ের নাচ নাচতে গিয়ে—
কখনও তিনি শুভংকর শিব, কখনও ভীম রুদ্র।
এই আদি অন্তহীন প্রভুকে, মানুষ আমরা
কি করে করব ধারণ আমাদের মানসপটে ?

০ ০ ০ ০

আত্ম-অভিমানের প্রাচীর গুড়িয়ে দিয়ে
এগিয়ে চলো দৈন্য আর একান্ত শরণাগতির পথে,
নিজেকে করে তোল তার সেবক আর কিঙ্কর
তবেই ত হবে প্রভুর করুণা সম্পাত
কল্যাণ আর অমৃতের ধারায় জীবন হবে প্লাবিত।

অপ্পরের দিব্য ভাবাবেশ আর ইষ্ট স্তুতির অমৃত ঝঙ্কারে নিতান্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন পাণ্ড্যরাজ মহেন্দ্র। তরুণ সিদ্ধ শৈব সাধকের পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁর কৃপা এবং আশ্রয় ভিক্ষা চাইলেন।

অপ্পরের কাছে রাজা শিবমন্ত্রে দীক্ষা নেবার পর সারা তামিল দেশে দেখা দিল শিব সাধনা ও সংস্কৃতির মহা উজ্জীবন।

০ ০ ০ ০

অপ্পরের কথা বলতে গিয়ে শিবভক্তিসিদ্ধ কিশোর সাধক 'জ্ঞান সম্বন্ধর'-এর নাম উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গটা যেন অপূর্ণ থেকে যায়। কিশোর সম্বরকে পেয়েছিলেন অপ্পর তাঁর পরিব্রাজনকালে চিদাম্বরের শৈবপীঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে বসে অপ্পর খুরপি হাতে পরগাছা আর ময়লা নিষ্কাশন করছিলেন এমন সময় ভক্তপ্রবর সম্বন্ধর সেখানে এসে তাঁকে দেখেই ভাবাবেশে ছুটে গিয়ে লুটে পড়েন তাঁর পদতলে।

আকুল কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হতে থাকে শুধু অপ্পর, অপ্পর।

চিনতে ভুল হয় নি অপ্পরের, তিনি তখনই এই কিশোর শিব-ভক্তকে সস্নেহে ভূমিতল থেকে তুলে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। বয়সের অনেক পার্থক্য থাকলেও শিবভক্তির জোরই দুজনকে গভীর প্রেমের বাঁধনে বেঁধে ফেলে। সম্বন্ধর অপ্‌পরকে দেখেন যেন তাঁর পিতা, আর অপ্‌পর দেখেন সম্বন্ধরকে নিজের সন্তানের মত, বন্ধুর মত। একসঙ্গে মহানন্দে পরিব্রাজন চলে বেশ কিছুকাল ধরে।

সম্বন্ধরের কথা এখানে বলার উদ্দেশ্য তিনি এক অদ্ভুত ধরণে ভক্তিসিদ্ধ। তাঁকে বরং কৃপাসিদ্ধ বলাই সঙ্গত। হরপার্বতীর কৃপায় বালক বয়সেই তার মাঝে আত্মপ্রকাশ করে অলৌকিক জ্ঞান আর যোগবিভূতি। অচিরে স্থানীয় শৈব ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তার এই অলৌকিক সিদ্ধির কথা।

সম্বন্ধর যখন নিতান্তই বালক তখন একদিন বাপের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন কাছেরই শিবমন্দিরে। স্নান তর্পণ সেরে পূজায় বসবেন বলে বাপ কুণ্ডের জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ছেন, ছেলে কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেখা গেল—বালক কি এক দিব্য ভাবে আবিষ্ট হয়ে থর থর করে কাঁপছে, দুই চোখ হয়ে উঠেছে রক্তবর্ণ, তারপর কেমন এক অদ্ভুত স্বরে বলছে, ঐ যে বাবা, ঐ যে আমার মা, বাবা আর মা, বাবা আর মা। এই সঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাচ্ছে শিবমন্দিরের চূড়ার দিকে।

বালককে এই রকম করতে দেখে বাপ মহা সন্ত্রস্ত হয়ে তীরে উঠে ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। ছেলে কি কোন কিছু দেখে হঠাৎ ভয় পেয়েছে, না বিষাক্ত কিছু পেটে যাওয়ায় পাগলের মত আবোল তাবোল বকছে?

পুত্র এর পরেই কিছুটা স্থির হ'ল, বাহ্য জ্ঞান ফিরে এল। এরপর বাপ ছেলের মুখে যা শুনলেন তা যেমনি অলৌকিক, তেমনি রোমাঞ্চ-কর। ছেলে কুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় মন্দির শীর্ষে নজর পড়তে দেখে ওখানে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন হর-পার্বতী। কৃপাময়ী জগন্মাতা একটা সোনার ভাঁড়ে দুধ নিয়ে

নীচে নেমে এসে স্নেহভরে সেই দুধ বালককে খাইয়ে গেলেন। সেই দুধের চিহ্ন এখনও বালকের মুখে লেগে রয়েছে।

হরপার্বতীর মূর্তি অবশ্য ক্ষণপরেই আকাশে মিলিয়ে, যায় কিন্তু তাঁদের অহেতুক কৃপার ফলে বালকের মাঝে প্রকাশ পেতে থাকে অলৌকিক জ্ঞান আর বিস্ময়কর যোগ বিভূতি।

এই অত্যাশ্চার্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুণ্ডের তীরে তখন বহু লোকের ভীড় জমে উঠেছে আর তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে হরপার্বতীর আশিসপূত বালক বয়স্ক লোকের মত আবৃত্তি করে চলেছে স্বরচিত অপরূপ শিবস্তোত্র। দাবানলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কৃপাসিদ্ধ বালকের এই অত্যাশ্চার্য কাহিনী। বালককালেই শিবের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে তাই ভক্ত সমাজ তার নাম রাখেন 'জ্ঞান সম্বন্ধর' অর্থাৎ ইনি দিব্যজ্ঞানের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত।

# অদ্বৈত আচার্য

অদ্বৈত আচার্যের পূর্ব নাম—পিতা মাতার দেওয়া নাম কমলাক্ষ। পিতা মাতার দেহান্তের পর গয়ায় এসে তাঁদের কাজ শেষ করবার পর দাক্ষিণাত্যের তীর্থ দর্শনে বেরিয়েছিলেন তিনি। এখানে একদিন তিনি ঘটনাক্রমে একদল মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধর্মসভায় এসে উপস্থিত হ'ন। সভায় সেদিন নারদীয় সূত্রের ব্যাখ্যা হচ্ছিল। এই ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে কমলাক্ষ হঠাৎ ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়েন।

দাক্ষিণাত্যের অদ্বিতীয় প্রেমিক সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী সেদিন এই মণ্ডলীতে উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তদের উচ্চকণ্ঠের হরিধ্বনি বার বার শুনবার পর কমলাক্ষের যখন সম্বিৎ ফিরে এল এবং শুনলেন আনন্দোজ্জ্বল দিব্যমূর্তি নিয়ে যে মহাপুরুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তিনিই হচ্ছেন মহাভাগবত মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ, তখন তিনি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষা চাইলেন, চাইলেন তাঁর কাছে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা।

সম্মত হলেন পুরী মহারাজ। তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার পর কিছুকাল তাঁর সান্নিধ্যে কাটাবার পর এসেছেন কমলাক্ষ ব্রজমণ্ডলে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থল দেখেন আর আনন্দে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। নানা স্থান দর্শন করবার পর হাজির হয়েছেন তিনি গিরি গোবর্ধনে। দিব্য আনন্দে হৃদয় ভরপুর। পুরুষোত্তমের দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি বিভাসিত হতে থাকায় বারবার তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেলছেন।

সারাদিন প্রেমোন্মত্ত হয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোর পর যখন রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল তখন দেহ বড় শ্রান্ত ক্লান্ত। পাশেই একটা বটবৃক্ষ দেখতে পেয়ে তার নীচে শুয়ে পড়লেন তিনি। দুই

চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল, ক্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি।

এই নিদ্রাবস্থায় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। কমলাক্ষ দেখলেন শিখি পুচ্ছধারী মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন ভঙ্গীতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দাঁড়িয়ে বলছেন, কমলাক্ষ গুরুর নির্দেশে জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা। সাধ্যমত ভক্তি-তত্ত্বের প্রচার করে যাও তুমি, জীবকে কৃষ্ণ নাম নিতে শেখাও। আর করো লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার এ ছাড়া আর একটা কাজের ভার দিচ্ছি আমি তোমাকে ; যমুনা তীরে দ্বাদশ আদিত্য তীর্থে আমার এক দিব্য মূর্তি লুকানো রয়েছে, নাম তার মদনমোহন। দ্বাপরে কুবজা আমার এই মূর্তি পূজা করতেন, সেবা করতেন। এখন এ মূর্তি যমুনা তটে ভূগর্ভে প্রোথিত। তুমি এ মূর্তির উদ্ধার সাধন করে সেবার ব্যবস্থা করো। এ ভার আমি তোমার উপরেই দিলাম।

এই স্বপ্ন দেখার পরই আচার্যের ঘুম ভেঙে গেল, আনন্দের আবেগে আর ঘুম হ'ল না। দিনের আলো দেখা দিতে না দিতে তিনি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সোৎসাহে গ্রামবাসীদের ডাকাডাকি স্বরু করে দিলেন। তাঁর মুখে তার স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনবার পর বহু গ্রামবাসী শাবল কোদাল নিয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল। এরপর চললো তারা সবাই দাদশ তীর্থের দিকে।

কিছুক্ষণ খনন চালাবার পরই বেরুল সেখান থেকে এক পরম সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি, ললিত ত্রিভঙ্গধামে দাঁড়িয়ে সে মূর্তি। আচার্যের সঙ্গে সমবেত গ্রামবাসী সব কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। কমলাক্ষ ভক্তি-মান সদাচারী এক ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের সেবার ভার দিয়ে বৃন্দাবনের দিকে রওনা হ'লেন।

প্রভু মদন মোহনের অলৌকিক লীলা এখানেই শেষ হয় নি, এর পর তিনি আর এক নতুন খেলা দেখালেন।

উত্তর ভারতে তখন রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাত চলেছে, চলেছে নানা বিপর্যয়। দেশে কেবল অশান্তি আর অনাচারের তাণ্ডব নৃত্য। স্বপ্নলব্ধ মদনমোহনের সেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে কমলাক্ষ ত বৃন্দাবনে

চলে গেলেন, এরপর এই বিগ্রহ নিয়েই ঘনিয়ে এল বিপদ।

ভূগর্ভ থেকে তোলা এই মনোহর বিগ্রহ দেখতে নানা ভক্ত আসে, ভিড় লেগেই থাকে। এদিকে নজর পড়ল একদল দুষ্ট প্রকৃতির পাঠানের। বিগ্রহ নিয়ে এত সমারোহ তাদের বরদাস্ত হয় নি, তাই এর মর্যাদাহানি করে ভেঙে ফেলতে তারা একদিন দল বেঁধে এল।

প্রভু মদনমোহন কিন্তু সেদিন দেখালেন এক অলৌকিক লীলা। পাঠানেরা কুটিরে প্রবেশ করে দেখে বিগ্রহ ত সেখানে নেই, তড়িৎ বেগে কে যেন সেখান থেকে সরিয়ে ফেলছে। কিন্তু সরিয়ে ফেলবার সুযোগ ত তারা দেয় নি, আশ্চর্য! হতাশ হয়ে তারা সেখান থেকে ফিরে গেল।

পাঠানরা যখন পূজা কুটিরে আসে নতুন পূজারী তখন যমুনায় দাঁড়িয়ে স্নান তর্পণে ব্যস্ত ছিলেন, পাঠানদের হামলার কথা শুনে ছুটে এসে দেখেন বেদীর উপরকার বিগ্রহ ত সেখানে নেই। ভাবলেন পাঠানরাই হয়ত বিগ্রহ অপবিত্র করে জলে ফেলে দিয়ে গেছে। খেদের অন্ত রইল না তাঁর। হায় হায় করে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

খবর শুনে কমলাক্ষও সেখানে ছুটে এলেন। বিগ্রহকে না দেখে নয়ন জলে তাঁর বুক ভেসে যেতে লাগল। অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন তিনি কত খোঁজাখুঁজি করলেন, বিগ্রহের কোন সন্ধানই মিলল না।

মনে বড় দুঃখ ক্ষোভ নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন—নিকটের এক বটবৃক্ষতলে। স্বপ্নযোগে দয়াল প্রভু তাঁর এ দুঃখ ঘুচিয়ে দিলেন। ব্রজবিহারী তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে বললেন, কমলাক্ষ, মিছেই তুমি খেদ করছ আর ভেবে মরছ। পাঠানেরা আমাকে ভেঙেও ফেলেনি, জলেও ফেলেনি, অপসারিতও করে নি। আমি নিজেই আগে থেকে ব্রজের সেই দুষ্টু গোপালটি সেজে বেদী থেকে নেমে চুপিচুপি বাইরে এসে কুটিরের গায়ে যে পুষ্পোদ্যান আছে তারই মাঝে একপাশে লুকিয়ে আছি। ওখান থেকে তোমরা আমায় তুলে নাও। হ্যাঁ, আর একটা কথা এখন থেকে আমার দুষ্টু গোপাল

লীলার স্মৃতিই ভক্তদের মনে জাগিয়ে রাখ, আমার বিগ্রহের নাম রাখ তোরা মদন-গোপাল। মদনমোহন নামটা এবার পাল্টে দাও।

ঘুম ভাঙার পর আনন্দে অধীর হয়ে ছুটলেন কমলাক্ষ কুটিরপার্শ্বস্থ সেই ফুলবাগানে। একটু খুঁজবার পরই মিলে গেল সেই কৃষ্ণমূর্তি। অতঃপর মদনগোপাল নামে তাঁর সেবাপূজা চলতে লাগল।

ঠাকুরের অলৌকিক লীলা এখানেই সাঙ্গ হ'ল না। আর একদিন রাত্রে কমলাক্ষের উপর স্বপ্নাদেশ হ'ল—আচার্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে রেখছ, সেখানে তেমন সুরক্ষিত নয়। ম্লেচ্ছদের অত্যাচার প্রায়ই এখানে হবার আশঙ্কা আছে। তুমি এক কাজ করবে, মথুরায় চৌবেজী শীগগির এখানে আসবে, তুমি তার হাতেই আমায় অর্পণ করবে। তা হ'লে আমার সেবাপূজা পাওয়ার আর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে না।

আচার্য এ হস্তান্তরে তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না, দুঃখ রেখো না কিছু মনে। বিগ্রহ অন্যত্র রক্ষিত হ'লেই বা কি, তোমার আমার সম্বন্ধ ত কোনদিন বিনষ্ট হবার নয়, এ সম্বন্ধ যে চিরকালের। তোমার মত ভক্তের মধ্যেই আমার লীলা নিত্যপ্রবাহিত। আর একটি কথা তোমায় বলছি,—শোন : আমার এক পট রয়েছে নিকুঞ্জবনে লুকানো। শ্রীরাধার সখী বিশাখার পরিকল্পনাতেই এ পট রচিত। তুমি এ পটটি উদ্ধার করে দেশে নিয়ে যাও।

স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শুনবার পরদিনই মথুরার চৌবেজী এসে হাজির। প্রভু মদনগোপালের অভিলাষ যে পূর্বরাত্রে তাঁর কাছেও পৌঁছে গেছে।

আচার্যের কাছে এসে তিনি তাঁর স্বপ্নবিবরণ ব্যক্ত করলে আচার্য সাশ্রুনেত্রে তাঁর প্রাণপ্রিয় মদনগোপাল বিগ্রহটি তাঁর হস্তে অর্পণ করলেন।

# রঘুনাথদাস গোস্বামী

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর দাস গোস্বামী রঘুনাথ এসেছেন শ্রীবৃন্দাবনে, আশ্রয় নিয়েছেন গোবর্ধনের পাদদেশে। নিকটেই তার উপবেশন ঘাট,—সেখানে বসে শ্রীচৈতন্য একদিন শ্যাম-কুণ্ড রাধাকুণ্ডের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন।

রঘুনাথ এখানকার বৃক্ষতলে বসেই সাধনভজন করবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু গোস্বামী সনাতন তা হতে দেন নি। গ্রামবাসীদের সাহায্যে অরিট গ্রামে তাঁর জন্য একটি সাধন কুটির তৈরী করিয়ে দিয়েছেন। এখানেই ত রয়েছে বৈষ্ণবদের সেই পরম প্রিয় শ্যামকুণ্ড। মহাপ্রভু তাঁর গোবর্ধন পরিক্রমাকালে ভাবাবেশে মত্ত থাকা অবস্থায় কুণ্ডদুটি আবিষ্কার করেন। রঘুনাথও ধ্যানবলে নির্ণয় করতে পেরেছেন কুণ্ড দুইটির সঠিক অবস্থান। কিন্তু অবস্থান জানলেই ত হ'ল না, এর রীতিমত সংস্কার করা দরকার, গভীর করে খনন করা দরকার, কারণ কুণ্ড দুটি এ সময়ে মজে গেছে, রূপান্তরিত হয়েছে নীচু ধানের ক্ষেতে।

এই পুণ্যকুণ্ড ভারতের বৈষ্ণব এবং ভক্ত জনসাধারণের ব্যবহার যোগ্য করবার জন্য প্রবল ইচ্ছা জেগেছে রঘুনাথের মনে, কিন্তু নিঃস্ব কাঙাল বৈষ্ণব তিনি এর সংস্কার ও খননের অর্থ পাবেন কোথায়? এ জন্য তাঁর ক্ষোভের সীমা পরিসীমা নেই।

এই সময় একদিন নিত্যকার ধ্যান ভজনের শেষে তিনি তাঁর ইষ্টদেবের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান, করুণাময় প্রভু, পবিত্র কুণ্ড দুটির সংস্কার খনন ইত্যাদি তুমি সম্ভব করে তোল, লক্ষলক্ষ লোকের উদ্ধারের ব্যবস্থা করো।

ভক্তিসিদ্ধ রঘুনাথের এ আর্তি বিফলে যায় নি, ভক্তবৎসল অচিরে তাঁর মনোসাধ পূর্ণ করেছেন।

সেদিন নিত্যকার গোবর্ধন পরিক্রমণ শেষ করে এসে বসেছেন রঘুনাথ নিজের কুটিরে। বসে ভাবছেন—তাইত এখনও রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড খননের কোন ব্যবস্থা হ'ল না? এ যে বড় সাধের কাজ আমার। ঠাকুর কবে কৃপা করবেন?

এমন সময় পশ্চিমী এক ধনী বৈষ্ণব নিকটে এসে তাঁর পাদবন্দনা করে করজোড়ে বললে, বাবাজী, আপনি কি গোস্বামী রঘুনাথ দাস?

হ্যাঁ বাবা, আমিই গোস্বামীদের দাস রঘুনাথ। কোথা থেকে আসা হচ্ছে বাবা। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন বলো, আমি নিশ্চয়ই সাধ্যমত তা করতে চেষ্টা করব।

পশ্চিমী লোকটা উত্তরে বললে, বাবা, এসেছি আমি আপনার কাছে বড় একটা জরুরী কাজে। এখন সোজা বদরি নারায়ণ থেকে আসছি আমি। পূজার মানত ছিল আমার প্রভু বদরিনাথের কাছে। বহু অর্থ ব্যয় করে সাড়ম্বরে তাঁর পূজা দেব বলে আমি বদরিনাথে গিয়েছিলাম। যেদিন পৌঁছলাম সেই দিন রাত্রেই স্বপ্নে আমার উপর ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হ'ল,—'এখানে আড়ম্বরে আমার পূজা করতে গিয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করবার প্রয়োজন নেই তোমার। শাস্ত্রের বিধান মত যে পূজা তাই শেষ করে সোজা চলে যাও তুমি ব্রজমণ্ডলের অরিট গ্রামে। সেখানে গেলেই পাবে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথ দাসকে। সে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড খননের কাজ করতে না পেরে বড় মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছে। বহু ব্যয় সাপেক্ষ এ কাজের ভার তুমিই হাতে নাও। রঘুনাথের অনুমতি নিয়ে তার অভীষ্ট এ কাজটি তুমিই সুসম্পন্ন করো। এতেই আমার বড় রকমের পূজা করা হবে। বাবা, ঠাকুরের এই প্রত্যাদেশ পেয়েই এসেছি আমি আপনার কাছে। পশ্চিমী লোকটার মুখে এই কথা শুনে রঘুনাথের দুই চোখ পুলকাশ্রুতে ভরে উঠল: অন্তর্যামী দয়াল প্রভু তা হ'লে তার অন্তরের আকুতি শুনেছেন,— নিজেই সব কিছুর ব্যবস্থার ভার নিয়েছেন?

অবিলম্বে দুই কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার ও খননের কাজ সুরু হয়ে গেল, কিছুদিনের মধ্যেই কুণ্ডস্থান পরিণত হ'ল দুটি স্নিগ্ধ সরোবরে। জলপূর্ণ

এই পবিত্র কুণ্ডদ্বয়ের কথা ব্রজমণ্ডলের সর্বত্র প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজারে হাজারে ভক্ত নরনারী এখানে এসে পুণ্যস্নান করে নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগল।

বৈষ্ণব সমাজে এখন থেকে রঘুনাথের এক নতুন নাম হ'ল—রাধাকুণ্ডের দাস গোস্বামী।

# পরমহংস দয়ালদাস বাবা

দয়ালদাস-বাবা এক বিরাট জমায়েতের নেতা হয়ে সেবার গঙ্গা-সাগর তীর্থে যাচ্ছেন। পৌষ শেষ হতে চলেছেন, প্রচণ্ড শীত আর ছাউনী পড়েছে তখন তাঁর মুঙ্গেরের কষ্ট হারিণা ঘাটে। দয়ালদাসজী ও তাঁর সাধু শিষ্যেরা বিহারের সেই ভয়ংকর শীতে খোলা আকাশের নীচে নদীর চড়ায় ধুনি জ্বালিয়ে আসন পেতে বসেছেন।

সেই শীতের রাত্রে আবার সেদিন হঠাৎ খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল। ফলে ধুনির আগুন গেল নিভে। দলের কয়েকজন সাধু দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন, তাই ত, ভারী মুস্কিল হ'ল ত। ধুনির কাঠ জুটবে কি করে, এই বৃষ্টির পর ধুনির কাঠ পাওয়া ত অসম্ভব।

শুনে হাসলেন দয়ালদাস-বাবাঃ ছাখো,—ভক্তের বোঝা ব'ন ভগবান, তোমরা এত ঘাবড়াচ্ছ কেন বলো ত? তোমাদের আহারের জন্য পুরী মালপো তৈরীর জন্য এ যাবৎ ধনী শেঠেরা কত আটা, ঘি, চিনি এনে হাজির করেছেন, দরিদ্র ভগবৎ ভক্তেরাও যে তোমাদের সেবার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। একটু সবুর কর, এখনই দেখবে এক গরিব কাঠুরে তোমাদের ধুনির জন্য এক বোঝা শুকনো কাঠ নিয়ে আসছে। যত খুশি ধুনি জ্বালিয়ে ধ্যানজপ করবে।

হ'লও ঠিক তাই। ঝড়বাদল থেমে যাবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই একটি লোক মস্ত বড় এক বোঝা শুকনো কাঠ মাথায় করে এসে হাজির। বোঝা নামিয়ে যুক্তকরে সে নিবেদন করে, বাবা, আমি বড় গরিব ছা-পোষা মানুষ, বন থেকে কাঠ কেটে আনি আর তাই বিক্রি করে যা পাই, তাই দিয়ে সংসার চালাই। ঘরে কিছু শুকনো কাঠ ছিল, এই শীতের রাত্রে আপনাদের ধুনির জন্যে তাই নিয়ে এলাম।

সাধুরা এবার পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন।

দয়ালদাস বাবার নির্দেশে তখন কাঠ ওয়ালাকে পরিতোষ করে পুরী মালপো খাইয়ে বিদায় দেওয়া হ'ল ।

° ° ° °

আর একদিনের কথা। গভীর রাত্রে দয়ালদাস-বাবা ধুনি জ্বালিয়ে বসে, আর তাঁর সামনে বসে শহরের একদল ভক্ত দর্শনার্থী। বাবা বেদান্ত ব্যাখ্যা করছেন আর নিত্যানিত্য বিচার সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন। সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে বাবার মুখে এই সব তত্ত্বকথা শুনছে। এদের মাঝে একজন হিন্দুস্থানী রয়েছে, সে এই কয়েক দিনের মধ্যেই বাবার বড় প্রিয় হয়ে উঠেছে। লোকটি শুদ্ধসত্ত্ব, ধর্মপ্রাণ, সাধনার উপযুক্ত আধার, তাই তার উপর পড়েছে দয়ালদাসজীর বিশেষ কৃপার দৃষ্টি।

রাত্রি বেশি হয়ে যাওয়ায় এই ভক্তটি বাড়ি ফিরবার জন্য বড় উতলা হয়ে বাবার অনুমতি চাইল।

বাবা এ সময় তন্ময় হয়ে তার ভক্তদের কাছে একটা পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি ভক্তটির কথা শুনে তার দিকে চেয়ে বললেন, আরে তুমি ত দেখছি ঘরে গিয়ে রসুই করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ। তোমার এত ব্যস্ত হবার দরকার নেই, এখানে ভগবৎ কথা শুনছ তুমি, তাই ভগবানই তোমার সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ঘরে ফিরেই দেখো তোমার ভোজনের সব কিছু তৈরী।

ভক্তটির অবশ্য ঘরে দ্বিতীয় কোন লোক নেই, নিজের আহার্য তাকে নিজেই রোজ তৈরী করতে হয়, তাই সে উঠবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। যাইহ'ক বাবার কথা শুনে সে নিরস্ত হ'ল। বাবার মুখের ধর্মালোচনা আগের মতই মন দিয়ে শুনতে লাগল।

বাবার আলোচনা শেষ হবার পর ভক্তটি বাড়ি ফিরে দেখে সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার এক নিকট আত্মীয় তার বাড়িতে এসেছে, এবং গৃহস্বামীর বাড়ি আসতে দেরী হচ্ছে দেখে সে নিজেই দু'জনার মত রুটি তরকারী তৈরী করে তার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে।

° ° ° °

হরিদ্বারে সেবার কুম্ভমেলা। দয়ালদাস-বাবা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সেখানে আগেই এসে গিয়েছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণানন্দ পরে এলেন মুঙ্গের থেকে, সঙ্গে তাঁর দুই সাধু এবং অন্নদা নামে তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। কৃষ্ণানন্দ পরমানন্দে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করছেন, গ্রহণ করছেন তাঁর কাছ থেকে নানা সাধন-নির্দেশ। তাঁর সঙ্গী তিনটি কিন্তু রয়েছেন শহরের একটা ভিন্ন ডেরায়। সেদিন সন্ধ্যায় সাধুদের ছাউনীতে ঘুরতে ঘুরতে অন্নদাবাবু ভিড়ের মাঝে কোথায় হারিয়ে গেলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। যাবে কি করে, সাধু আর পুর্ণার্থী ত একটি দুটি নয়, লক্ষ লক্ষ। দুই দিন কৃষ্ণানন্দের বড় দুশ্চিন্তায় কেটে গেল ঃ কে জানে অন্নদাবাবু কোথায় আছেন, আহার জুটছে কি না—তাই বা কে বলবে? অনেক ভেবে চিন্তে কৃষ্ণানন্দ শেষে ঠিক করলেন, এ বিপদের কথা গুরুজীর কাছে বলবেন, তাঁর কাছে ত কোন কিছুই লুকানো থাকে না, তাঁর কাছে বললেই সন্ধান মিলবে।

এরপর বাবার দর্শনও কৃষ্ণানন্দ কয়েকবার পেলেন কিন্তু কথাটা আর তিনি তাঁর কাছে তুলতে পারলেন না। বাবার ওখানে সব সময়ই ধর্মপ্রসঙ্গ চলে, চলে নানা তত্ত্ব আলোচনা। সে সবে মন না দিয়ে কে কোথায় হারিয়ে গেছে, কোথায় আছে, খেয়েছে কি না—এই সব তুচ্ছ কথা বলে গুরুজীকে বিব্রত করতে আর তাঁর মন চায় না, নিজের আজ্ঞাতে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণেই তাঁর মন নিবিষ্ট হয়ে যায়।

এরই এক ফাঁকে অতীতের একটি ঘটনার কথাও কৃষ্ণানন্দের মনে উঁকি মেরে যায়। গুরুজী তখন মুঙ্গেরে। কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হঠাৎ এসে বাবার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন ঃ তাঁর একমাত্র পুত্র কোথায় হারিয়ে গেছে, তাকে ফিরে না পেলে তিনি আর প্রাণে বাঁচবেন না। তার এই কষ্ট দেখে বাবার মন গলে গেল, তিনি তখনই ভদ্রলোকটিকে তার পুত্রের সন্ধান বলে দিলেন, ফলে অনতি বিলম্বে পিতাপুত্রের মিলন ঘটল।

এই ঘটনা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানন্দের মনে হ'ল ; অচেনা একটি লোকের দুঃখের কথা শুনে তাঁর কৃপালু গুরুজী তাঁর হারানো

ছেলের খোঁজ বলে দিলেন আর আমি তাঁর প্রিয় শিষ্য, আমার অন্তরের ব্যথা কি তিনি বুঝবেন না? নিশ্চয়ই বুঝবেন। অন্তর্যামী তিনি, মহা শক্তিধর, আমার অবস্থার কথা বুঝে নিশ্চয়ই একটা কিছু তিনি করবেনই।

কৃষ্ণানন্দ যখন এই রকম কথা ভাবছেন—দয়ালদাস বাবা তখন তাঁকে হঠাৎ বলে বসলেন, বেটা, কোন পথ দিয়ে তুমি আজ আমার ছাউনিতে এসেছ আর ফিরবেই বা কোন পথে?

উত্তরে কৃষ্ণানন্দ বললেন, বাবা, সাধুদের মণ্ডলী দেখতে দেখতে কনখলের পথে আজ আমি আপনার এখানে এসেছি, আর ঐ পথেই ফিরে যাবার ইচ্ছা।

দয়ালদাস বাবা বললেন, না, বেটা, ও পথ দিয়ে তুমি যাবে না, সামনের নৌ সেতু পার হয়ে ভীমগড়ার পথে তুমি তোমার ডেরায় ফিরে যাও।

কৃষ্ণানন্দ বললেন, বাবা, ও পথ যে আমি চিনি না।

পথ চেনো না তাতে কি হয়েছে, লোকের কাছে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই জানা যাবে, ঐ পথেই তুমি আজ অতি অবশ্য ফিরবে।

গুরু মহারাজের আদেশ অমান্য করবেন কৃষ্ণানন্দ কি করে? তাই একটু জিজ্ঞাসাবাদ করে ভীমগড়ার পথ ঘুরেই তিনি নিজের ডেরার দিকে চললেন। এই পথে কিছুটা যাবার পরই কৃষ্ণানন্দ দেখেন তাঁর বন্ধু অন্নদা উদ্‌ভ্রান্তের মত পথের একধারে বসে। শরীর এমনিতেই তাঁর অসুস্থ ছিল, তার উপর লোকের ভিড়ের চাপে মাথা ঘুরে তিনি পড়ে যান। এ দুদিন অসহ্য কষ্টে তাঁর দিন কেটেছে।

কৃষ্ণানন্দ তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখেই ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর হাত ধরে অতি সন্তর্পণে বাসায় নিয়ে গিয়ে তাকে সুস্থ করেন।

কৃষ্ণানন্দের এবার বুঝতে বাকী রইল না—বিপন্ন অন্নদাকে উদ্ধার করার জন্যই অন্তর্যামী গুরুদেব তাঁর ভীমগড়ার পথে যেতে এত জিদ করছিলেন।

• • • •

কুম্ভমেলা ভেঙে গেছে। সাধুসন্ত ও যাত্রীরা সব দলে দলে হরিদ্বার ত্যাগ করে যাচ্ছেন। সাহারাণপুরে গিয়ে তবে ট্রেন ধরতে হবে, কারণ তখনকার দিনে হরিদ্বার অবধি ট্রেন লাইন বসে নি। লোকে গরু, ঘোড়া বা উটের গাড়ি করে সাহারাণপুরে এসে তবে ট্রেন ধরে। কৃষ্ণানন্দ এবং তার সহযাত্রীরা গাড়ির খোঁজে এসে দেখেন বাহনকেন্দ্রে একটি গাড়িও নাই, সব গাড়িই ভাড়া হয়ে গিয়েছে। এখন উপায়? সেইদিনই যে তাঁদের রওনা না হ'লে নয়, না যেতে পারলে কোন কোন যাত্রীর সমূহ বিপদ।

মধ্যাহ্নকাল। চারিদিকে প্রচণ্ড রৌদ্র। পদব্রজে সাহারাণপুর রওনা হওয়া তখন কিছুতেই সম্ভব নয়।

কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে কৃষ্ণানন্দ তাঁর গুরু মহারাজকেই স্মরণ করতে লাগলেন। এই তাঁর স্বভাব ক্ষুদ্র হ'ক বৃহৎ হ'ক জীবনের যে কোন সমস্যায় পড়লেই তিনি তাঁর গুরু শরণ নেন। স্মরণ করতেই দয়ালদাস বাবার প্রেমঘন মূর্তিটি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠায় দুশ্চিন্তার মেঘ গেল কেটে, সঙ্গী যাত্রীদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, সাহারাণপুর যাওয়া নিয়ে আর ভাববেন না আপনারা, দুশ্চিন্তা রাখবেন না মনে, শীগগিরই যা হ'ক—এর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সহযাত্রীরা তাঁর এ কথা শুনে তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন এমন সময় অপরিচিত এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সেখানে এসে হাজির। কৃষ্ণানন্দকে নমস্কার করে তিনি বললেন, আপনারা কোথাকার লোক, কোথায় যেতে চান—বলুন ত আমাকে।

মুঙ্গের থেকে এসেছি আমরা। ট্রেন ধরতে সাহারাণপুর যেতে চাই কিন্তু গরু, ঘোড়া বা উটের কোন গাড়ি আমরা যোগাড় করতে পারি নি।

ঠিক আছে, এখন নিশ্চিন্তে থাকুন। এখানে বিকালে গাড়ি নিয়ে আসব আমি আপনাদের জন্যে, ভাববেন না আপনারা—এই বলেই ভদ্রলোক সেখান থেকে চলে গেলেন।

বিকেলে ভদ্রলোক ঠিক একটা ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করে সেখানে এসে হাজির। কৃষ্ণানন্দ এবং সঙ্গীদের তিনি এরপরে অতি যত্নে

সেই গাড়িতে তুলে রওনা করে দিলেন সাহারাণপুর ষ্টেশনের দিকে।

কোত্থেকে কি করে সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মুস্কিলের সময় হাজির হলেন, ছুটাছুটি করে গাড়ি যোগাড়ই বা তিনি করতে গেলেন কেন আর সকলের কাছে এটা রহস্যময় মনে হলেও কৃষ্ণানন্দ কিন্তু স্পষ্ট বুঝলেন তাঁর কৃপালু গুরু মহারাজই এই আগন্তুকের মাধ্যমে তাঁর শরণাগত শিষ্যকে আজকের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

° ° ° ° °

উত্তর ভারতের কয়েকটা তীর্থ পরিব্রাজন করে কৃষ্ণানন্দ ফিরে যাচ্ছেন বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলে। গাড়ি পালটাতে হবে তাঁর বাড় ষ্টেশনে। কয়েক দিন ট্রেনে ট্রেনে কেটেছে শরীর বড় ক্লান্ত। এর মাঝে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়াল নেই।

হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে তিনি দেখেন যে ট্রেনটিতে তিনি রয়েছেন সেটি ধীরে ধীরে একটি স্টেশন থেকে চলতে সুরু করেছে। কোন স্টেশন এটা—কোন স্টেশন.—সন্ন্যাসীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বললে,—এটা বাড় স্টেশন—ত্রিহুত যেতে হলে যেখানে গাড়ি বদল করতে হয়। কোথায় যাবেন আপনি ?

যাত্রীদের মুখে এই কথা শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলেন কৃষ্ণানন্দ : হায় গুরুদেব, এ কি বিপদে পড়লাম আমি, বদল করতে না পারলে যে আমার অনেক জরুরী কাজ নষ্ট হয়ে যাবে, অনেক ঘুরে অনেক পরে যে আমার এখানে আবার আসতে হবে। গুরুদেব আপনিই আমার ভরসা।

আশ্চর্য ব্যাপার! সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানন্দের কানে এল এঞ্জিনের একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ, গাড়িটি অমনি থেমে গেল। তখনও অবশ্য গাড়িটি প্লাটফর্মের সীমানা ছাড়ায় নি। সুযোগ পেয়ে ত্বরিৎপদে কৃষ্ণানন্দ তাঁর মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লেন ট্রেন থেকে। গার্ড ও ড্রাইভার তখন ছুটাছুটি সুরু করেছে। কয়েক মিনিটের মাঝে গাড়ির এঞ্জিন ঠিক করা হয়ে গেলে গাড়িটি আবার তার গন্তব্যপথে চলতে সুরু করল।

কৃষ্ণানন্দের নয়ন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। তিনি তখন বুঝলেন এই

এজিন বিকল হওয়ার মূলে রয়েছে তাঁর গুরু মহারাজেরই করুণালীলা। শিষ্যের ক্লেশ নিবারণের জন্য এ তাঁরই এক যোগবিভূতির খেলা।

• • • •

পরমহংস দয়ালদাস সেবার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে পদব্রজে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ তিরুপতিতে যাচ্ছেন, দর্শন করবেন ওখানকার বালাজী বিগ্রহ। বাবার কার্যসিদ্ধির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় অন্যান্য সম্প্রদায়েরও অনেক সাধু তাঁর দলে এসে মিশেছেন। ফলে একটা বড় জমায়েত নিয়েই তাঁর পথ চলতে হচ্ছে।

কিছুদূর এগুবার পরই সামনে পড়ল এক বিস্তৃত বনাঞ্চল। লোকের বসতি এখানে খুবই কম। দয়ালদাস তাঁর সঙ্গীদের ডেকে বললেন, এখানকার লোকেরা বড় ধার্মিক, সজ্জন, সাধুদের জন্য তারা বেশ ভাল ভাণ্ডারা দিয়েছে, সবাই আচ্ছা করে খেয়ে নাও। এ বনেতে কা'ল আর তোমাদের অন্ন জুটবে না।

বাবা যা বললেন ঠিক তাই হ'ল, পরদিন তাঁরা যে পথে চললেন তা কেবলই অরণ্যময়, পথে জনমুনিষ্যির দেখা মিলল না—কোন বসতি ত দূরের কথা। সারাদিন অনাহারে পথ চলে সাধুরা রীতিমত ক্লান্ত হয়ে পড়লেম, ক্ষুৎপিপাসায় সবাই বড় কাতর।

তাদের এই অবস্থা দেখে দয়ালদাস বাবা ধ্যানাসনে বসে তাঁর ব্রহ্মলীন গুরুদেব ঠাকুরদাস মহারাজকে স্মরণ করে আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলেন,—বাবা এতগুলি সাধু আজ আমার সঙ্গে চলেছে, আজ কোন ভাণ্ডারা মিলবে—এমন কোন সম্ভাবনা নেই। এরা সবাই আমার মুখ চেয়ে রয়েছে, তুমি কৃপা করে এর একটা বিহিত করো বাবা। দয়ালদাসজীর এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসপটে উদিত হ'ল একটা বিরাট বৃক্ষ,—তার ডালে ডালে ঝুলে রয়েছে পাকা পাকা কত সুস্বাদু ফল।

এই দেখার পরই দয়ালদাস বাবা তাঁর আসন থেকে উঠে তাঁর শিষ্যদের বললেন, তোমরা আশেপাশে শীগগির একটু তল্লাসী চালাও, আজ আহার মিলবে আমাদের কোন বৃক্ষের কাছ থেকে। ছাখো,

খুঁজে ভাখো এখানকার কোন বৃক্ষে আহার যোগ্য কোন ফল রয়েছে কিনা।

শিষ্যেরা তখনই আশেপাশে খোঁজাখুঁজি সুরু করে দিলেন। একটু খোঁজার পরই দেখা গেল একটু দূরেই রয়েছে একটা বৃহৎ আম্র বৃক্ষ, আর তার ডালে ডালে ঝুলে রয়েছে অজস্র পাকা পাকা ফল। জমায়েতের সাধুরা সেদিন ঐ আম্রভোজন করেই ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করলেন।

ক্ষুন্নিবৃত্তির পর সাধুরা লক্ষ্য করলেন এই বিরাট অরণ্যে আশেপাশে এই একটি ছাড়া ত আর কোন আম্রবৃক্ষ নেই, আর আমের সময়ও ত এটা নয়। তবে ?—কারোই বুঝতে বাকী রইল না যে পরমহংস দয়ালদাস বাবার কৃপাতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

° ° ° °

পরমহংস দয়ালদাস বাবা তাঁর জমায়েত নিয়ে কয়েকটা তীর্থ ঘুরবার পর সেবার যাত্রা করেছেন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের দিকে। পায়ে হেঁটেই চলেছেন সবাই। খুব বড় একটা মাঠ পার হবার পর সূর্যাস্ত হ'ল। আশেপাশে কোন গ্রাম নেই যে কোন গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় মিলবে। জমায়েত এবার যে পথে চলেছে, তা একে ত প্রস্তরময় তা ছাড়া মাঝে মাঝে কণ্টক আর জঙ্গলে দুর্গম। বড় কষ্টেই চলতে হচ্ছে জমায়েতের সাধুদের, কাঁটা আর পাথরের ঘায়ে অনেকেরই পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। সেদিন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, একে ত ঘোর অন্ধকার, তার উপর সারা আকাশ জুড়ে সুরু হ'ল মেঘের ঘনঘটা। পথের নিশানা বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে, সাধুরা মাঝে মাঝে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে বিপন্ন বোধ করছেন। এই রকম সংকট দেখে সাধুরা সব রামদয়াল বাবার কাছে কাতর মিনতি করে বলতে লাগলেন, আপনার আশ্রয়ে থেকেও এ কি সঙ্কটে প'ড়তে হ'ল আমাদের। একে ত পথশ্রমে দেহ আমাদের অবসন্ন, তাতে ঘন অন্ধকার রাত্রি, তার উপর আবার সুরু হ'ল মেঘের গর্জন। আমাদের সঙ্কটে আপনি একটু আমাদের মুখের দিকে চা'ন!

বাবা বললেন, তোমরা তোমাদের সব ভার পরমাত্মায় ন্যস্ত করে সাধু হয়েছে, বিপদের মুখে তোমাদের এমন অধীর হ'লে চলবে কেন ? পরমাত্মাকে স্মরণ করে তাঁর কৃপা ভিক্ষা চাও, তিনি অবশ্যই শুনবেন তোমাদের প্রার্থনা।—নির্বিকার চিত্তে প্রশান্ত কণ্ঠে দয়ালদাস-বাবা উচ্চারণ করলেন এই কথাগুলি। এর পরই কিন্তু দেখা গেল এক অতি বিস্ময়কর দৃশ্য :

জমায়েতের সাধুরা দেখলেন হঠাৎ তাদের সামনে এক উজ্জল অলোক জ্বলে উঠল, এই সঙ্গে একরকম সবাই দেখলেন স্থূলকায় এক নগ্ন পুরুষ প্রদীপ্ত জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে জমায়েতের আগে আগে নেচে নেচে চলেছেন আর কৃষ্ণবর্ণা এক নারীও তালে তালে নেচে নেচে তাঁর সঙ্গে চলেছেন। সামনে এমন মশালের উজ্জল আলোক দেখে সাধুরা বেশ খুশী মন নিয়ে ঐ আলোর পিছন পিছন চললেন। বেশ কিছু দূর এমনি যাবার পর হঠাৎ আলোটা নিভে গেল। যে কৃপালু দিগম্বর পুরুষ এতক্ষণ আলো দেখাচ্ছিলেন তাঁকেও আর দেখা গেল না, তাঁর সঙ্গিনী কৃষ্ণা দিগম্বরীকেও না।

অতঃপর সাধুরা চমকে উঠে দেখলেন তাঁরা একটা গ্রামের মধ্যে এসে গেছেন। এখানে থাকবার ব্যবস্থা হবার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল।

গ্রামে নিরাপদ আশ্রয় মিলবার পর সাধুরা দয়ালনাস বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এতক্ষণ আলো ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে আনলেন তিনি কে ?

বাবা বললেন, এতক্ষণও চিনতে পার নি তোমরা ? সাধুরা ভয় পেয়ে ডাকলে যিনি অভয় দেন, ভক্ত দুঃখে পড়লে যিনি তার কষ্ট দূর না করে থাকতে পারেন না, ইনি যে তিনিই। আজ বিপাকে পড়ে হরপার্বতীর দেখা পেয়েছ তোমরা।

ভক্তবৎসলের এই অপার কৃপার পরিচয় পেয়ে সাধুদের আনন্দের অবধি রইল না।

• • •

মণ্ডলী নিয়ে দয়ালদাস-বাবা সেবার কিছুদিন লাহোরে অবস্থান

করছিলেন। কয়েক দিন ধরে জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষুদের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তর চললো, বহু পঞ্জাবী সাধক এসে তাঁর কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা নিলেন, এরপর সেখানকার ডেরা-ডাণ্ডা তুলবেন তুলবেন বলছেন অথচ তুলছেন না দেখে এক সেবক প্রশ্ন করে বসলেন, কা'ল যে বলছিলেন এখানকার ডেরাডাণ্ডা এবার উঠাতে হবে, কই এ সম্বন্ধে ত আর কোন নির্দেশ দিচ্ছেন না।

দয়ালদাস-বাবা উত্তর বললেন, হ্যাঁ বেটা, এবার আমরা এখান থেকে উঠবো, কিন্তু দুটি লোকের জন্য যে আমার অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তারা ত দেখছি এখনও এসে পৌঁছালো না।

সেবকটি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে, কারা আসবে, বাবা, আপনার কোন পুরানো ভক্ত ?

এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ কেমন অন্তর্মুখীন হয়ে যান দয়াল-দাসজী, আপন মনে বলতে থাকেন, আচ্ছা, বেচারা কতদূর থেকে ছুটে আসছে, হয়রান হয়ে পড়েছে, পা দুটো হয়েছে জখম। হ্যাঁ, প্রাণে মুমুক্ষার আগুন জ্বললে মানুষ এমনি ব্যাকুলতা নিয়েই ছোটে বটে !

উপস্থিত শিষ্য সেবকেরা এবার বাবাকে আচ্ছা করে চেপে ধরলে তিনি আর আসল কথাটি ভেঙে না বলে পারলেন না। বললেন, শোন এখান থেকে বহু দূরের পথ সতানা গ্রাম। সেখান থেকে মুন্না আহুকার নামে এক মুমুক্ষুভক্ত আসছে এখানে। আমার দর্শন সে কোনদিন পায় নি, স্বপ্নে দেখেছে এখান থেকেই হবে তার সন্ন্যাস-দীক্ষা। তাই সে জীবন পন করে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে আমার কাছে। এমন মুমুক্ষা জেগেছে যার তাকে ত ঠেকানো যায় না, তাই আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি।

কয়েক ঘণ্টার মাঝেই সেই বৈরাগ্যবান লোকটি দয়ালদাস-বাবার ছাউনীর সামনে এসে দাঁড়ায়, তারপর কেঁদে লুটিয়ে পড়ে তাঁর চরণ-তলে, বারবার নিবেদন করতে থাকে তার প্রাণের আকাংক্ষা।

বিমুখ করেননি দয়ালদাসজী এই মুমুক্ষু ভক্তকে। সেই দিনই শুভলগ্ন দেখে দান করেন তাকে সন্ন্যাসদীক্ষা। সন্ন্যাস আশ্রমের

নতুন নাম দেওয়া হয় তার দয়ানন্দ স্বামী। গুরুর নির্দেশ মত তপস্যা করে দয়ানন্দজী উত্তর কালে সার্থক নাম সাধুতে পরিণত হ'ল। দীর্ঘকাল তিনি কাশীতে অবস্থান করে তাঁর গুরু ভাই আনন্দ প্রকাশজীর সঙ্গে উত্তর ভারতের নানা তীর্থে নিজেকে অন্নদানব্রতে নিয়োজিত করেন।

অন্তর্যামী মহাপুরুষ দয়ালদাসজী আর যে লোকটির জন্য লাহোরে অপেক্ষা করছিলেন অল্প কালের ব্যবধানে সেও এবার এসে হাজির হয়। লোকটি জাতিতে জাঠ, লাহরের কাছেই গোছীগাঁও এ তার বাড়ী। বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক, দেশে চষেবাসের ভাল খামার—জমি আছে। একটি মাত্র তার কন্যা, এই কন্যাকে নিয়ে মহাবিপন্ন হয়ে পড়েছে লোকটি। কন্যা নিদারুণ উন্মাদ রোগে ভুগছে। জোতদার বাপ ভাল ডাক্তার কবিরাজ ডেকে তার চিকিৎসার কিছু বাকী রাখে নি। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নি। গোছীগাঁও-এর বহুলোক এর মাঝে লাহোরে এসে দয়ালদাস-বাবাকে দর্শন করে গেছে, তাঁর যোগবিভূতির খ্যাতি শুনে গেছে। লোকের কাছে শুনেই সেই জাঠ তার কন্যার রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়ে বাবার কাছে ছুটে এসেছে।

বাবার চরণতলে লুটিয়ে পড়ে লোকটি কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে, বাবা, এই মেয়ে ছাড়া সংসারে আমার আপন লোক বলে আর কেউ নেই। কয়েক বৎসর আগে মায়ের মৃত্যু হয়েছে। সেই থেকে এই মেয়ের দিকে চেয়েই আমি দিন কাটাচ্ছি। কয়েক বৎসর আগে এর মাথা বিগড়ে গেছে, একেবারে পুরো উন্মাদ এ! এর কোন চিকিৎসার বাকী রাখিনি আমি, কিছুতেই কিছু হ'ল না। আপনি কৃপা করে একে রোগ মুক্ত করে আমার প্রাণ বাঁচান—এই ভিক্ষা আপনার শ্রীচরণে।

লোকটির কথা শুনে দয়ালদাস বাবার চোখ দুটি ছলছল করে এল, তিনি পরম স্নিগ্ধ কণ্ঠে তাকে বললেন, বেটা, তুমি আর কেঁদো না, ওঠো উঠে স্থির হয়ে বসো। তোমার জন্যেই যে আমি এখনও লাহোরে অপেক্ষা করছি। তোমার কন্যা আমার অচেনা অজানা নয়, তার পূর্ব জন্মের সকল খবর আমি রাখি। ডাক্তার কবরেজ দিয়ে ওর চিকিৎসা

করাতে গিয়ে তুমি মহা ভুল করেছ। আসলে ওর উম্মাদ রোগ নয়। চিকিৎসকেরা ওর অসুস্থতার কারণ ধরতে পারেনি।

এ কি বলছেন, বাবা—তা হ'লে—

বলছি, বেটা। এ জন্মে ও তোমার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু আসলে ও পূর্বজন্মের এক যোগভ্রষ্টা সাধিকা। তোমার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণের কিছুকাল পর থেকেই ওর মনে পূর্ব স্মৃতি কিছুটা জেগেছে, পূর্বের যোগসিদ্ধির অনুভূতি স্ফুরিত হবার অবকাশ খুঁজছে। কন্যা তোমার উম্মাদ রোগগ্রস্থা নয়, ভুগছে ও যোগন ব্যাধিতে। আমি আশীর্বাদ করছি আজ থেকে ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে, খুঁজে পাবে ও ওর সাধনার ভিত্তি।

বাবার কথা শুনে আর্ত জাঠ ভক্তটি যেন তার ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। সে যুক্ত করে দয়ালদাসজীকে বললে, বাবা, আপনার কৃপার কথা এতদিন লোক মুখেই শুনে এসেছি, এবার নিজে তা প্রত্যক্ষ করে জীবন আমার ধন্য হয়ে গেল। বাবা, এত কৃপাই যদি আমায় করলেন, তবে আর একটু ভিক্ষা চাই: আপনার চরণামৃত কিছুটা আমায় দিন, গোছীগাঁওয়ে গিয়ে আমার কন্যাকে তা পান করাবো।

দয়ালদাস বাবা বললেন, তার কোন প্রয়োজন নেই। তবে তার মঙ্গলের জন্য আর একটি কাজ তুমি করো ত বড় ভাল হয়। তোমার মেয়ের জন্যে বাড়ীতে ছোট শিবমন্দির তৈরী করে দাও, কন্যা তোমার শিব বিগ্রহের পূজা এবং জপ ধ্যান নিয়ে থাকুক। এতে ভাল হবে তার। আমি আবার আশীর্বাদ করছি পূর্ব্বজন্মের সাধনা তার সার্থক হয়ে উঠুক, মোক্ষের পথে সে আরও অগ্রসর হ'ক।

ভক্ত জাঠটি বাবার এই নির্দেশ মাথা পেতে নেয় এবং অনেক অনুনয় বিনয় করে দয়ালদাস বাবার কিছুটা চরণামৃত সংগ্রহ করে রওনা হয় নিজের গোছীগাঁও-এর দিকে।

o o o

অন্নদান ব্যাপারে দয়ালদাস বাবার যে লীলা দেখা যেত, তা নিঃসন্দেহে অলৌকিক বলা চলে। অন্নাদি প্রস্তুত হয়ে গেলে তিনি তা একবার দেখে সদ্‌গুরুর কৃপা প্রার্থনা করতেন, তারপরই অনুমতি

দিতেন পরিবেশনের। কত লোক ভোজনে বসবে তা কোন দিনই জানা থাকত না, মণ্ডলীর লোক ছাড়া অনাহূত রবাহূত কত লোকই ত ভোজনে এসে বসত, কিন্তু আশ্চর্য কোনদিনই বাবার ভাণ্ডারে অন্নের ন্যূনতা লক্ষিত হয় নি।

হৃষীকেশে একবার সাধু ভোজনকালে যতগুলি সাধুর অন্ন প্রস্তুত ছিল, তা ছাড়িয়ে অন্তত আটশত সাধু বেশি হাজির হ'লেন, তা সত্ত্বেও অন্নের কোন ঘাটতি হ'ল না, বরং কিছু উদ্বৃত্তই রয়ে গেল। পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সবাই ভোজন করেছিলেন।

যখন যে তীর্থেই তিনি যান না কেন তাঁর নাম শুনলেই দোকানদারেরা তাঁর মণ্ডলীর জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে সরবরাহ করত, মূল্য কে দেবে সে প্রশ্ন তারা কোনদিনই করত না। কোন চিঠিপত্রেরও দরকার হ'ত না শুধু স্বামী দয়ালদাসের নাম শুনলেই হ'ল। তিন চার হাজার টাকার জিনিস দিয়েও দোকানদারেরা কোন পাওনার তাগিদ করত না। এ তাদের জানাই ছিল বাবা স্থান ত্যাগ করার আগেই কেউ না কেউ এ টাকা তাদের পরিশোধ করবেই। বস্তুতঃ ঘটতও তাই। এ নিয়ে যেমন স্বামীজীর তেমনি দোকানদারের কারোই কোন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হ'ত না।

১২৯৭ সালের কথা। হরিদ্বারে সেবার কুম্ভমেলা। দয়ালদাস বাবা মেলার শেষে তাঁর মণ্ডলী নিয়ে অন্যত্র যাবার আয়োজন করছেন এমন সময় মণ্ডলীর একজন সাধু এসে বাবাকে জানালেন দোকানদার প্রায় সাত আট হাজার টাকার সামগ্রী যুগিয়েছেন, বাবার ভক্তেরা তা প্রায় শোধ দিয়েছে, কিন্তু আটশত টাকা দিতে এখনও বাকী। শুনে বাবা একটু হেসে বললেন, ঘাবড়াচ্ছ কেন, দেখো এ শোধ দিয়েও দুইশত টাকা উদ্‌বৃত্ত থাকবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার তার পরের দিনই কোথেকে এক ধনী ভক্ত এসে বাবার চরণের পাশে এক হাজার টাকার একটা থলি রেখে প্রণাম করলে। সাধুরা দেখে ত অবাক। দোকানদারের আটশত টাকা শোধ দেবার পরেও উদ্‌বৃত্ত রইল দুইশো।

বাবার মণ্ডলীতে অর্থ সঞ্চিত রাখবার রেওয়াজ নেই। যত্র আয়

তত্র ব্যয়। শিষ্যেরা তখন বাবাকে বললে, বাবা এ দুই শো টাকা কি করা হবে নির্দেশ দিন।

বাবার ছাউনীতে তখন অন্য মণ্ডলীর কয়েক জন সাধু এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, দয়ালদাসজী তখন তাঁদের কাছে ডেকে এনে শিষ্যদের বললেন, তোমরা যে দুশো টাকা বেঁচে গেছে বলছিলে তা থেকে এদের ট্রেনভাড়া দিয়ে দাও, তারপরে যা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে এদের দুই একখানা শাস্ত্রগ্রন্থ এবং বহির্বাসের কাপড় কিনে দিয়ে ল্যাঠা একেবারে চুকিয়ে দাও।

° ° ° °

বাবা ভগবানদাসজী আলোয়ারের এক প্রসিদ্ধ মোহান্ত। কয়েক বৎসর তিনি দয়ালদাসজীর মণ্ডলীর সঙ্গে ভারতের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। সেবার কুরুক্ষেত্রে এক বিরাট ধর্মমেলার অনুষ্ঠান হচ্ছে। ভগবানদাসজী তখন দয়ালদাসজীর জমায়েতের সঙ্গেই রয়েছেন। দয়ালদাস মহারাজ তাঁর মণ্ডলী নিয়ে সেই মেলায় উপস্থিত। তাঁর তরফ থেকে সাধুসন্ত, দর্শনার্থী ভক্ত এবং কাঙালীদের জন্যে ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা হয়েছে। রোজ হাজারের উপর লোককে অন্নদান করা হচ্ছে।

ভাণ্ডারার সকল ভার ন্যস্ত হয়েছে বাবা ভগবানদাসজীর উপর। মেলা শেষ হয়ে গেছে, এবার ডেরাডাণ্ডা তুলবার পালা। ভগবানদাসজী দেখলেন ধনী শেঠ এবং দর্শনার্থীদের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল তা সব খরচ হয়ে গিয়েছে অথচ দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা তখনও শোধ হয় নি, দু'হাজার টাকার মত এখনও তাদের পাওনা। এদিকে দু' এক দিনের মাঝেই তাঁবু তোলা হবে।

ভগবানদাসজী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দয়ালদাসজীর সামনে গিয়ে বললেন, বড় ভাবনায় পড়া গেল ত!

কেন?

দু'এক দিনের মাঝেই ত আমরা এখান থেকে উঠতে যাচ্ছি অথচ দোকানদারদের পাওনা টাকা ত এখনও শোধ করা যায় নি। কি উপায় হবে?

দয়ালদাসজী বললেন, টাকাটা এখানে কেন ব্যয় করা হয়েছে? সাধুদের জন্যে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার বেটাবেটীর বিয়েতে খরচ করিনি ত টাকা?

আজ্ঞে না।

তবে এত দুশ্চিন্তার কারণ কি তোমার বলো? প্রতিদিনই ত লক্ষ্য করে এসেছ, এ সবের ব্যবস্থা সদ্‌গুরুই সব সময় করে দিচ্ছেন, তবে ভাবনা কি হে তোমার? এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন?

এর দু'দিন পরেই দেখা গেল এক সিন্ধী বণিক কুরুক্ষেত্রে এসেই অমনি ছুটে এলেন দয়ালদাসজীর কাছে। এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে দু'হাজার টাকার একটা তোড়া রাখলেন বাবার চরণের পাশে।

দয়ালদাস বাবা তখনই ভগবানদাসজীকে ডেকে এনে তোড়াটি তাকে দেখিয়ে হেসে বললেন, ভাবছিলে ত? এই দেখ সদ্‌গুরু তোমার ভাবনা দূর করলেন। এতে দু'হাজার টাকা আছে। দোকানদারদের পাওনা এবার চুকিয়ে দাও। তারপর আমরাও চলো অন্যত্র রওনা হই।

o o o

দয়ালদাস বাবা সেবার গয়া থেকে রাজগীরে যাচ্ছেন। যাত্রার প্রাক্‌কালে গয়ার ভক্তেরা তাঁকে বললে, মহারাজ, রাজগীর যাবার পথ বড় জনবিরল, সমৃদ্ধ গ্রাম ট্রাম আশেপাশে তেমন নেই। তিনশো লোকের জমায়েত আপনার সঙ্গে, পথে ত ভোজনের দ্রব্য মিলবে না। আমরা এখান থেকেই প্রচুর আটা ঘি, চিনি আপনাদের সঙ্গে দিতে চাই।

গম্ভীর স্বরে বাবা বলে উঠলেন, না, এই জমায়েতের সঙ্গে কোন আহার্য দেবার দরকার নেই।

জমায়েতের ভেতর থেকে দুইজন প্রবীণ সাধু তখন দয়ালদাসজীকে বললেন, বাবা, আপনার জমায়েতে তিনশত লোক রয়েছে; জনহীন পথে এত লোকের আমরা আহার্য দেব কি করে? অনাহারে কষ্ট হবে যে সবার! এরা যখন স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইছেন তখন তা

সঙ্গে নিয়ে যেতে দোষ কি ?

উত্তরে মিষ্টি হেসে দয়ালদাসজী বললেন, পথে যা দরকারে লাগবে তা নিয়ে সংসারীদের মতই যদি আমরা পথ চলব তা হ'লে ঘর ছেড়েছি কেন বলো ত ?

আহার্য না জুটলে এতগুলি লোকের কষ্ট হবে এই ভেবেই আমরা এ কথা বলেছি।

সদ্‌গুরু যখন সব সময়েই এই মণ্ডলীর উপর কৃপাদৃষ্টি রেখেছেন দেখছ, তখন তোমাদের এ সব ভাবনার কি কারণ থাকতে পারে বুঝি না।

বলা বাহুল্য বাবার এ কথার উপর শিষ্য সেবকদের কি কথা বলার থাকতে পারে, তারা দয়ালদাসজীর আদেশ শিরোধার্য করে পদযাত্রা সুরু করে দিলেন।

বেলা তখন দ্বিপ্রহর। গ্রীষ্মের সূর্য পথচারীদের উপর তখন অগ্নি কিরণ বর্ষণ করে চলেছে। মণ্ডলীর সাধুরা পথশ্রমে কাতর, ক্ষুৎ পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়। চলতে গিয়ে পথের ধারেই ছোট একটা গ্রামের এক বটগাছ দেখতে পেয়ে জমায়েতের সাধুরা তার তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দয়ালদাস বাবার সামনে হাজির হ'লেন এক ভক্ত শেঠ। পরম ভক্তিভরে তিনি বাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, আজ দু'দিন হ'ল তাঁবু খাটিয়ে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। স্বপ্নে আমি প্রত্যাদেশ পাই, আপনি সাধুদের এক বড় জমায়েত নিয়ে এই পথ দিয়ে যাবেন, আপনার সেবার জন্য আমি যেন প্রস্তুত থাকি।

দয়ালদাস শেঠজীর এই কথা শুনে তাঁর মণ্ডলীর দিকে চেয়ে দুষ্টু হাসি হাসতে থাকলেন : সংসারীদের মত বোঝা নিয়ে পথ চলেনি বলেই এই সজ্জন তোমাদের সেবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছেন।

শুনে জমায়েতের এক প্রবীণ সাধু মন্তব্য করলেন, মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গীতায় বলেছেন—তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাম্ যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—আপনার বেলায় দেখছি প্রভু সব সময়ই তা প্রয়োগ করছেন আমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করতে।

শেঠজীর লোকেরা সাধুদের ভোজ্য আগে থেকেই তৈরী করে রেখেছে। তাই সাধুরা একটা বিশ্রামের পর সুস্থ হ'লেই তাদের সামনে এল ভারে ভারে গরম লুচি, হালুয়া আর মালপো। সবাইকে পরিতোষ করে আহার করিয়ে শেঠজী বিদায় নিলে বাবার জনায়েত আবার পথ চল্‌তে সুরু করলো।

০ ০ ০ ০

সেবার প্রয়াগে অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলার শেষে দয়ালদাস মহারাজ মণ্ডলীর তিনশত সাধু নিয়ে কানপুরে এসে ছাউনী ফেলেছেন। এখানকার ভক্তদের সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়ে যাবেন গুজরাট আর পাঞ্জাব।

এদিকে হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার আমন্ত্রণে বক্তৃতা দিতে বাবার শিষ্য কৃষ্ণানন্দ স্বামী এসেছেন কানপুরে। বাবার ছাউনীতে এসে কৃষ্ণানন্দ ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম জানানোর পর বাবা তাঁকে আশিস জানিয়ে বললেন, বেটা, তুমি যে এ সময়ে কানপুরে এসে গেছ, এ খুব ভালই হয়েছে, কারণ এরপর এ অঞ্চলে আর আমার আসা হবে না, এ মরদেহে থাকাও হবে না। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ সাক্ষাৎ।

শুনে কৃষ্ণানন্দের চোখ দুটি ছলছল করে এল ঃ সে কি কথা বাবা, এমন অলক্ষুণে কথা বলছেন কেন আমায় ?

দয়ালদাস বাবা শান্ত কণ্ঠে বললেন, হাঁ বেটা, এবার আমার শরীর ছেড়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে,— বড় জীর্ণ হয়ে গেছে এটা।

কৃষ্ণানন্দ ব্যথিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, না বাবা, না এমন কথা বলবেন না। আপনাকে পেয়ে সংসারের সব কিছু ভুলে কেমন দিব্য আনন্দে দিন কাটাচ্ছি। আপনি—দেহ ছাড়লে আমাদের কি দশা হবে ?—আমরা যে হয়ে পড়ব একেবারে নিরাশ্রয়।

বাবা স্মিত হাস্যে বললেন, নিরাশ্রয় কেন হবে ? দেহের সান্নিধ্য পাওয়াই ত বড় কথা নয়, আমার আত্মা, আমার শাশ্বত পরম সত্তাই ত হচ্ছে আসল বস্তু। তার সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই ত যোগ সাধিত হয়েছে, সে ত কোনদিন হারাবার নয়। আমার সেই পরম সত্তারই নিত্য আশীর্বাদ পাবে তোমরা। সুতরাং দুঃখ কি ?

শেষ